রণক্ষেত্র

প্রফুল্ল রায়

প্রকাশক:
শ্রীপ্রবীরকুমার মজুমদার
নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রাঃ) লিঃ
৬৮, কলেজ স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০৭৩

মুদ্রক:
বি. সি. মজুমদার
নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রাঃ) লিঃ
৬৮, কলেজ স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০৭৩

প্রচ্ছদ:
ধীরেন সাসমল

প্রথম প্রকাশ
১৫ই এপ্রিল ১৯৬৫

সুবোধ দাশগুপ্ত
প্রিয়বরেষু

বাড়ির কাছ থেকেই রিক্সা নিয়েছিল দীপা। অনেকগুলো অলি-গলি ঘুরে এখন সেটা সঠিক রাস্তায় এসে পড়েছে।

দীপা শুনেছে বৃটিশ আমলে রাস্তাটার নাম ছিল রবসন স্ট্রীট। স্বাধীনতার পর কলকাতা কর্পোরেশন নাম বদলে করেছে হরপ্রসাদ সরণি। হরপ্রসাদ চৌধুরী ছিলেন বিখ্যাত স্বাধীনতা সংগ্রামী, পরাধীন ভারতে ইংরেজদের জেলে জীবনের অর্ধেক ক্ষয় করেছেন। তাঁর নামেই এ রাস্তার নাম।

জায়গাটা দক্ষিণ কলকাতায়। এখানে এলে মনেই হয় না, এটা ক্যালকাটা মেট্রোপলিসের একটা অংশ। আশি কি নব্বুই লক্ষ মানুষের এই সুবিশাল শহরের ভিড়, চিৎকার, হৈ-চৈ, টেনসন, উত্তেজনা, পোড়া গ্যাসোলিনের তীব্র গন্ধ—কিছুই এখানে নেই। রাস্তাটা নির্জন, চুপচাপ একটা দ্বীপের মতো। 'পপুলেসন এক্স-প্লোসানে'র এই শহরের মধ্যে থেকেও যেন হরপ্রসাদ সরণি কলকাতার বাইরে।

ঝকঝকে রাস্তাটার দু'ধারে প্রচুর গাছপালা—দেবদারু, কৃষ্ণচূড়া বা ঝাড়ালো রেন-ট্রি। আর চোখে পড়ে বিরাট বিরাট কমপাউণ্ডওলা একেকটা বাড়ি। বেশির ভাগই বৃটিশ আমলে তৈরি। গথিক স্ট্রাকচার, মোটা মোটা থাম, সামনে সবুজ কার্পেটের মতো লন, ফুলের বাগান, টেনিস কোর্ট, লোহার ঘোরানো সিঁড়ি, ইত্যাদি ইত্যাদি।

সবে শীতের শুরু। সময়টা ডিসেম্বরের গোড়ার দিক। দারুণ একটা ঠাণ্ডা এখনও পড়েনি। তবে উত্তুরে হাওয়া এর মধ্যেই এ শহরে হানা দিয়ে যাচ্ছে।

কিছুক্ষণ আগে ন'টা বেজেছে। কাছাকাছি কোনো একটা থানার সাইরেনের আওয়াজ থেকেই তা টের পাওয়া গেছে।

দ্রুত একবার কব্জি উল্টে ছোট্ট ঘড়িটা দেখে নিল দীপা। ন'টা বেজে সাত। সে জানে দশটার ভেতর না পৌঁছুতে পারলে মণিমোহন চ্যাটার্জীর সঙ্গে দেখা হবে না। কাঁটায় কাঁটায় দশটাতেই তিনি বেরিয়ে যান। হাতে এখনও প্রচুর সময়, তবু অসহ্য উদ্বেগে দীপার স্নায়ুগুলো স্টিলের তারের মতো টান টান হয়ে গেল। শুধু উদ্বেগই নয়, অদ্ভুত এক উত্তেজনা এবং মারাত্মক ভয়ও।

এমনিতে দীপা খুবই সাহসী এবং তেজী ধরনের মেয়ে। ব্যক্তিত্বও তার প্রবল। কিন্তু মণিমোহন চ্যাটার্জীর সঙ্গে দেখা করতে আসার আগে সাতটা দিন ভয়ে এবং অস্থিরতায় ঘুমোতে পারেনি। দু পা বাড়িয়ে তিন পা পিছিয়ে গেছে। শেষ পর্যন্ত ভয়টা অবশ্য কাটিয়ে উঠেছে, মণিমোহনের সঙ্গে দেখা না করে তার উপায় নেই। কেন না, যত দেরি হবে তার পক্ষে অবস্থা ততই বিপজ্জনক হয়ে উঠবে।

দীপার বয়স বাইশ তেইশ। লম্বাটে ডিমের মতো মুখ। রং বেশ ফর্সাই। ভাসা ভাসা মাঝারি চোখ, পাতলা ঠোঁট, ধারাল নাক। ছোট কপালের ওপর থেকে চুলের ঘের। চুল বেশ ঘন আর কালো। সেগুলো একবেণী করে পিঠের ওপর ফেলে রাখা হয়েছে।

পরনে একটা জেলজেলে সিল্কের প্রিন্টেড শাড়ি, সবুজ ব্লাউজ, পায়ে কম দামের স্লিপার। সারা শরীরে এক টুকরো ধাতুর চিহ্ন পর্যন্ত নেই। না হার, না চুড়ি, না কিছু। বাঁ হাতের কব্জিতে স্টীলের সরু ব্যাণ্ডে ওয়েস্ট অ্যাণ্ড ওয়াচ কোম্পানির পুরনো গোল লেডিজ ঘড়ি। ঘড়িটা ছিল দীপার মায়ের। এটা তাদের বহুকাল আগের প্রায় ভুলে-যাওয়া সুদিনের স্মৃতিচিহ্ন। পায়ের কাছে মাঝারি সাইজের চামড়ার সুটকেশ। সুটকেশটা যে কত বছর আগের, দীপা জানে না। ওটার মধ্যে রয়েছে কিছু শাড়ি জামা এবং টুকিটাকি ক'টা জিনিস।

এখন, এই ডিসেম্বর মাসে আকাশের কোথাও একটুকরো মেঘ বা কুয়াশা নেই। শীতের ঝকঝকে নীলাকাশ থেকে সকালের মায়াবী রোদ সোনালি ঢলের মতো নেমে এসেছে দক্ষিণ কলকাতার এই রাস্তাটায়। ঝলমল করছে চারদিক।

এত বেলাতেও রাস্তায় লোকজন বেশ কম। মাঝে মাঝে দু-চারটে প্রাইভেট কার, স্কুটার কি সাইকেল হুস করে পাশ দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে।

কোনোদিকেই লক্ষ্য নেই দীপার। যদিও সে মণিমোহনদের বাড়ির নম্বর জানে এবং মাস দুই-তিন আগে এসে দেখেও গেছে, তবু পলকহীন পর পর বাড়িগুলো দেখে যাচ্ছে।

আরো খানিকটা যাবার পর মোড়ের মাথায় সাতষট্টি নম্বর বাড়িটা চোখে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে বুকের ভেতর শ্বাস আটকে গেল দীপার। 'এই, থামো, থামো'—কাঁপা গলায় রিক্সা থামিয়ে, ভাড়া মিটিয়ে, সুটকেশ হাতে নেমে পড়ল দীপা।

সামনেই লোহার প্রকাণ্ড গেটওলা বাড়িটার গায়ে পেতলের হরফে নম্বরটা বসানো রয়েছে। গেটের দু'পাশ থেকে উঁচু বাউণ্ডারি ওয়াল, তার মাথা ঘন লতায় ঘেরা। গেটের ডান পাশের দেওয়ালে পেতলেরই ঝকঝকে প্লেটে বাড়িটার নাম এনগ্রেভ করে লেখা ঃ এমারেল্ড হাউস।

রিক্সাওলা চলে গেছে। তারপরও অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল দীপা। বুকের ভেতর হৃৎপিণ্ডটা আগেই থমকে গিয়েছিল। এখন সেখানে কয়েক শো ঘোড়া একসঙ্গে দৌড়তে লাগল। মিনিট কুড়ি-পঁচিশ আগে রিক্সায় ওঠার সময় থেকে যে ভয় এবং উৎকণ্ঠা এক মুহূর্তের জন্যও তার সঙ্গ ছাড়েনি, সেগুলো হঠাৎ হাজার গুণ বেড়ে গেল।

মাত্র দশ গজ দূরে এমারেল্ড হাউসের বিশাল লোহার গেট। দীপা একবার ভাবল, ওখানে যাবে না। যদি মণিমোহন চ্যাটার্জী তার সঙ্গে দেখা না করেন, বা দেখা করলেও অপমান করে তাড়িয়ে দেন? তার চাইতে বরং আর একটা রিক্সা ডেকে ফিরেই যাওয়া যাক।

পরক্ষণেই দীপার মনে হল, এমারেল্ড হাউসের দশ গজের মধ্যে এসে এখন আর ফিরে যাওয়া যায় না। তার শারীরিক এবং মানসিক যে অবস্থা তাতে মণিমোহন চ্যাটার্জীর সঙ্গে দেখা হওয়াটা একান্ত জরুরি।

দীপা শুনেছে, মণিমোহন চ্যাটার্জী অত্যন্ত রাগী এবং বদমেজাজী, গম্ভীর আর রাশভারী। প্রচণ্ড ব্যক্তিত্ব তাঁর। তিনি একজন বড় ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট। এ ছাড়া বড় বড় তিন-চারটে কোম্পানির ডাই-রেক্টরও। তবু দীপা যেখানে এসে পৌঁছেছে সেখানে দাঁড়িয়ে এই লোকটার সঙ্গে শেষ যুদ্ধটা করতেই হবে।

হয় এই যুদ্ধে সে জিতবে, নইলে চিরকালের মতো অন্ধকারে তলিয়ে যেতে হবে। মনের সবটুকু সাহস এবং জেদ জড়ো করে এলোমেলো পায়ে দীপা সামনের দিকে এগিয়ে গেল।

গেটের কাছে আসতেই কোত্থেকে একটা ধপধপে উর্দি-পরা নেপালী দারোয়ান মাটি ফুঁড়েই যেন ওধারে এসে দাঁড়াল। বলল, 'কিসকো মাঙ্‌তা ?'

দীপা বলল, 'মণিমোহন চ্যাটার্জীর সঙ্গে দেখা করতে চাই।'

দারোয়ানের মোঙ্গলিয়ান মুখে রীতিমত বিস্ময় ফুটল। চাপা চোখ দুটো অনেকখানি বড় করে দীপার পা থেকে মাথা পর্যন্ত দ্রুত একবার দেখে নিল সে। খেলো পোশাক, হাতে রং-উঠে যাওয়া পুরনো স্যুটকেশ। এভাবে কেউ এ বাড়িতে আসে না। দারোয়ান জানতে চাইল, বড়ে সাব অর্থাৎ মণিমোহন চ্যাটার্জীর সঙ্গে মোলাকাত করার ব্যাপারে আগে থেকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করা আছে কিনা।

দীপা মাথা নাড়ল—অ্যাপয়েন্টমেন্ট করা নেই।

দারোয়ান কপাল কুঁচকে বলল, 'তব্‌ তো বহোৎ মুশকিল হো গিয়া।'

দীপার বুকের ভেতরটা ধক্ করে উঠল। উদ্বিগ্ন মুখে সে বলল, 'কিসের মুশকিল ?'

দারোয়ান জানায়, অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছাড়া বড়ে সাব কারও সঙ্গে দেখা করেন না।

দীপা ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল, 'তাহলে কি দেখা হবে না?' একটু ভেবে আবার বলল, 'আমি খুব বিপদে পড়ে তাঁর কাছে এসেছি।'

দারোয়ান সন্দিগ্ধ চোখে কিছুক্ষণ দীপাকে লক্ষ্য করল। তারপর জিজ্ঞেস করল, 'বড়ে সাবের সাথ আপনার কি দরকার? নৌকরি-উকরির জন্যে এসেছেন?'

দীপা অবাক হয়ে গেল, 'নৌকরি-উকরি—মানে চাকরি?'

'হাঁ।'

দারোয়ান একপাশে ঘাড় হেলিয়ে বুঝিয়ে দিল, অনেকেই চাকরি-বাকরির জন্য বড়ে সাবকে উত্যক্ত করে তোলে। তাই বড়ে সাবের কড়া হুকুম, চাকরির উমেদারদের যেন বাড়িতে ঢুকতে না দেওয়া হয়। দীপা যদি তেমন উদ্দেশ্য নিয়ে এসে থাকে, বড়ে সাবের সঙ্গে দেখা হবে না।

দারোয়ানের কথায় সামান্য ভরসা পাওয়া গেল। জোরে শ্বাস টেনে দীপা দ্রুত বলে উঠল, না না, আমি চাকরির জন্যে আসিনি।

একটু চুপ করে থেকে দারোয়ান বলল, 'আপনার সাথ বড়ে সাবের জান-পয়চান আছে?'

দারোয়ানটা একেবারে বিরুদ্ধ পক্ষের উকিলের মত জেরা শুরু করে দিয়েছে। খাঁটি শিল্পপতির লোক তো—মনে মনে ভাবল দীপা। বলল, 'না না, উনি আমাকে চেনেন না। কখনও দেখেননি।'

কি একটু ভাবল দারোয়ান। হয়তো দীপার চেহারা বা পোশাক-টোশাক দেখে তার কিছুটা করুণাই হয়ে থাকবে। বলল, 'থোড়া ঠ্হর যাইয়ে। বড়ে সাবের কাছে আপনার কি নাম বলব?'

'নাম বলে লাভ নেই। বলবেন জুররি কাজে একটি মেয়ে আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে।'

'ঠিক হ্যায়।'

বন্ধ গেটের বাইরে দীপাকে দাঁড় করিয়ে দারোয়ান চলে গেল।

সঙ্গে সঙ্গে দীপার বুকের ভেতর ঝড় বয়ে যেতে লাগল যেন। মণিমোহন চ্যাটার্জী কি তার সঙ্গে দেখা করবেন?

মিনিট তিনেক বাদে দারোয়ানটা ফিরে এল। আস্তে আস্তে মাথা নেড়ে বলল, 'মোলাকাত নেহী হোগা।'

এমনিতে মোঙ্গলিয়ানদের ভাবলেশহীন মুখে সুখ দুঃখ আনন্দ বা হতাশা, কিছুই তেমন ফোটে না। তবু দারোয়ানটাকে দেখে মনে হল, মণিমোহন চ্যাটার্জীর সঙ্গে দীপাকে দেখা করিয়ে দিতে পারলে সে খুশিই হতো।

দেখা হবে না! অত্যন্ত হতাশ দেখাল দীপাকে। তার পা দুটো থরথর করে কাঁপতে শুরু করেছে। চারপাশের দৃশ্যাবলী দ্রুত ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে। মনে হল, সে আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে না, হুড়মুড় করে হাঁটু ভেঙে, ঘাড় গুঁজে পড়ে যাবে।

কিন্তু কয়েক সেকেণ্ড মাত্র। তার পরেই অদম্য এক সাহস এবং রাগ তার ওপর ভর করল যেন। নিজের অজান্তে সে চেঁচিয়ে উঠল, 'দেখা না করে আমি যাব না। কিছুতেই না।'

দারোয়ানটা চমকে উঠল। কিছুক্ষণ আগেও যাকে ভীরু এবং কুণ্ঠিত মনে হয়েছে, খুব নীচু গলায় ভয়ে ভয়ে যে কথা বলছিল, আচমকা তাকে এভাবে চিৎকার করতে দেখলে হকচকিয়ে যাবারই কথা। দারোয়ান বোঝাতে চাইল, বড়ে সাব খুব ব্যস্ত আছেন, এখন কারও সঙ্গে কথা বলার সময় নেই তাঁর। ইচ্ছা হলে, দীপা তার ঠিকানা দিয়ে যেতে পারে। পরে সুবিধে মতো বড়ে সাব যোগাযোগ করে নেবেন। তখন দীপা তার জরুরি কথা বলার সুযোগ পাবে।

গলার স্বর আরেক পর্দা চড়িয়ে দিল দীপা, 'পরে নয়। এখনই তাঁর সঙ্গে দেখা করতে দিতে হবে।'

দারোয়ান এবার ভয়ে ভয়ে ভেতরে বাড়িটার দিকে তাকাল। তারপর মুখ ফিরিয়ে বলল, 'দিদিজী, আপ যাইয়ে। চেল্লামেল্লি করলে বড়ে সাব বহুৎ গুস্‌সা হবেন।'

কণ্ঠস্বর একই জায়গায় রেখে দীপা বলল, 'গুস্‌সা হলে হবেন।

তাতে আমার কিছু যায় আসে না। তুমি যদি দেখা করিয়ে না দাও, আমি গেটের বাইরে বসে থাকব। বাড়ি থেকে বেরুতে তো হবেই। তখন তোমার বড় সাহেবকে ধরব।' দারোয়ানকে প্রথম প্রথম সে আপনি করেই কথা বলছিল। এখন প্রচণ্ড উত্তেজনার বশে 'তুমি' করে বলতে শুরু করেছে।

দারোয়ান খুবই বিপন্ন বোধ করল। সাহেব সকালের দিকটা নিজের ফ্যাক্টরি এবং অফিসের নানা কাজকর্ম নিয়ে মগ্ন হয়ে থাকেন। এই সময় হৈচৈ করলে কাজে মন দিতে পারেন না। ফলে ভীষণ রেগে যান। এদিকে এই অচেনা মেয়েটা চেঁচামেচি করে তাকে কি ফেসাদেই না ফেলেছে। তাকে থামাবার জন্য হাতজোড় করে বলতে লাগল, 'আপ আজ যাইয়ে দিদিজী। অন্য দিন আসুন, জরুর মোলাকাত করিয়ে দেব।'

কিন্তু দারোয়ানের কাকুতি-মিনতি কিছুই কানে তুলল না দীপা। উন্মাদের মতো সে সমানে চিৎকার করে যেতে লাগল।

যখন এই সব চেঁচামেচি চলছে সেই সময় ভেতর দিক থেকে একটা আধবুড়ো বেয়ারা গোছের লোক দৌড়তে দৌড়তে গেটের কাছে চলে এল। শশব্যস্তে বলল, 'কি হচ্ছে এ সব ? কে এত হল্লা করছে ? সাহেব রাগ করছেন।'

দারোয়ান কিছু বলার আগেই দীপা বলে উঠল, 'আমি হল্লা করছি। তোমাদের সাহেব যতক্ষণ আমার সঙ্গে দেখা না করছেন, আমি চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে সাত পাড়ার লোক জড়ো করে ফেলব। যাও, বল গিয়ে তোমার সাহেবকে।'

বেয়ারাটা হতভম্বের মতো দু-চার সেকেণ্ড দাঁড়িয়ে রইল। তারপর ঊর্ধ্বশ্বাসে বাড়ির দিকে ছুটল এবং একটু পরেই আবার ফিরে এসে বলল, 'আসুন আমার সঙ্গে।' দারোয়ানকে বলল, 'গেট খোল।' যন্ত্রচালিতের মতো দারোয়ান ধাতব শব্দ করে লোহার বিশাল গেট খুলে দিল।

দুই

আগে ভাল করে লক্ষ্য করেনি দীপা। ভেতরে ঢুকতেই চোখে পড়ল, নুড়ির রাস্তা সোজা সামনের দিকে চলে গেছে। সেটার একদিকে সবুজ কার্পেটের মতো লন। সেখানে অনেকগুলো গার্ডেন আমব্রেলার তলায় বেতের সোফা-টোফা সাজানো। একটা মালি মোয়ার দিয়ে সমান মাপে ঘাস ছেঁটে যাচ্ছে। রাস্তাটার আরেক দিকে নানারকম মরশুমী ফুলের বাগান। সেখানে অন্য একটা মালি বড় কাঁচি দিয়ে ফুলগাছের বুড়ো পাতা বা শুকনো ডাল ছেঁটে দিচ্ছে। লনের ওধারে উঁচু কমপাউণ্ড ওয়ালের গায়ে টানা ব্যারাকের মতো খানকয়েক ঘর গা ঘেঁষাঘেঁযি করে দাঁড়িয়ে আছে। দেখেই টের পাওয়া যায়, ওগুলো সার্ভেন্ট এবং মালিদের কোয়ার্টার্স।

নুড়ির রাস্তাটা সোজা গিয়ে বিরাট থামওলা একটা তেতলা বাড়ির সিঁড়ির কাছে থেমেছে।

বেয়ারাটার সঙ্গে নুড়ির রাস্তা পেরিয়ে সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠে এল দীপা। এখানে মোটা মোটা অগুনতি থাম লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সিঁড়ির পেছনে চৌকো চৌকো শ্বেত-পাথর বসানো অনেকখানি জায়গা জুড়ে বারান্দা। তারপর থেকে সারি সারি ঘরগুলো। দরজা-জানালা বিরাট বিরাট। জানালাগুলোর দুটো করে পাল্লা। একটায় খড়খড়ি, আরেকটায় পলকাটা রঙিন কাচ।

বেয়ারা একটা ঘর দেখিয়ে বলল, ‘এখানে একটু বসুন। বড় সাহেব এখনই আসবেন।’

বেয়ারা চলে গেল। আর দীপা আস্তে আস্তে সামনের প্রকাণ্ড ঘরটায় গিয়ে ঢুকল।

গোটা ঘরটার মেঝে ছ'ইঞ্চি পুরু দামী কার্পেটে মোড়া। চারদিকে কম করে সাত-আট সেট সোফা। এ ছাড়া সুদৃশ্য কাশ্মীরী কাঠের

স্ট্যাণ্ডে পেতলের নকশাদার ফ্লাওয়ার ভাস। দু-পাশের দেওয়াল কেটে কাচের পাল্লা বসিয়ে নানা ধরনের বই রাখা হয়েছে। হিস্ট্রি সোসিওলজি অ্যানথ্রোপোলজি থেকে শুরু করে নানা সাবজেক্টের বই। তা ছাড়া আছে এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা এবং ওয়ার্ল্ড বুক সিরিজের সেট। এত বিচিত্র ধরনের বই জীবনে কখনও চোখেও দেখেনি দীপা।

একটা দেওয়াল ঘেঁষে উঁচু স্ট্যাণ্ডে টি. ভি.। আরেকটা দেওয়ালের পুরোটা জুড়ে অ্যাকুয়েরিয়ামে নানা দেশের লাল নীল সবুজ হলুদ, এমনি নানা রঙের মাছেরা খেলা করছে। সিলিং থেকে ঝাড়লণ্ঠনের মতো আলোর ঝাড় নেমে এসেছে। দুই দেওয়ালে দুটো এয়ারকুলার।

সুটকেশ নামিয়ে একটা সোফার কোণের দিকে জড়োসড়ো হয়ে বসল দীপা। এখান থেকে লন মালি গেট ফুল অর্কিড—সবই দেখা যাচ্ছে।

দীপা আগেই শুনেছিল মণিমোহন চ্যাটার্জীরা বিরাট বড়লোক। শুনতে শুনতে মোটামুটি একটা ধারণা করে নিয়েছিল। এখন বাড়ির ভেতর পা দিয়ে মনে হচ্ছে, যা সে ভেবেছিল, মণিমোহনরা তার চাইতে অনেক গুণ বেশী বড়লোক।

হঠাৎ আবছাভাবে পায়ের আওয়াজ কানে এল। এই বিশাল ড্রইং রুমটার অনেকগুলো দরজা। চমকে মুখ ফেরাতেই দীপা দেখতে পেল, ভেতর দিকের দরজার কাছে মধ্যবয়সী একটি পুরুষ দাঁড়িয়ে আছেন। বয়স ষাটের কাছাকাছি। গায়ের রং বাদামী। ছ' ফুটেরও বেশী হাইট। লম্বাটে ভরাট মুখ, চওড়া কপাল, ধারাল চিবুক, পুরু ঠোঁট এবং কঠিন চোয়াল।

'বৃষস্কন্ধ' বলে একটা কথা আছে, ভদ্রলোককে দেখলে তাই মনে পড়ে যায়। ছড়ানো বিশাল কাঁধ তাঁর, হাত দুটো হাঁটু ছাড়িয়ে নেমে এসেছে। মোটা মোটা হাড়ের ফ্রেমে মজবুত সুদৃঢ় স্বাস্থ্য। কাঁচাপাকা চুল ব্যাক-ব্রাশ করা।

সব চাইতে বিস্ময়কর তাঁর চোখ। গায়ের রং-এর মতোই মণি দুটো বাদামী। তাঁর তাকানোর ভঙ্গি, মোটা রোমশ ভুরু, শক্ত চিবুকের গঠন—এ সবের মধ্যে তাঁর ব্যক্তিত্ব যতটা, তাঁর চাইতে অনেক বেশী নিষ্ঠুরতা যেন ফুটে রয়েছে। এই মানুষটাকে ঘিরে কোথায় যেন মোটা মোটা অদৃশ্য দেওয়াল খাড়া হয়ে আছে। সেগুলো ভেঙে তাঁর কাছাকাছি যাওয়া খুবই দুরূহ ব্যাপার।

এমন এক প্রচণ্ড শক্তিমান প্রতিপক্ষের সঙ্গে যুদ্ধ করে জেতা প্রায় অসম্ভব। এমারেল্ড হাউসে আসার আগে বার কয়েক শ্বাস বন্ধ হয়ে গিয়েছিল দীপার। আরও একবার হল পনেরো ফুট দূরে দরজার ফ্রেমের নিচে দাঁড়ানো মানুষটিকে দেখে। নিজের অজান্তে কখন যে উঠে দাঁড়িয়েছে, দীপা টের পায়নি। সে বুঝতে পারছিল ইনিই মণিমোহন চ্যাটার্জী।

মণিমোহনের চোখে মোটা ফ্রেমের চশমা। দরজার কাছে দাঁড়িয়েই পুরু লেন্সের ভেতর দিয়ে তীক্ষ্ণ চোখে দীপাকে লক্ষ্য করতে লাগলেন তিনি। অ্যাপয়েন্টমেণ্ট ছাড়া আসার জন্য বিরক্তিতে তাঁর কপাল কুঁচকে আছে। দীপার জেলজেলে শাড়ি, রুক্ষ চুল, খেলো চটি ইত্যাদি দেখতে দেখতে বিরক্তির সঙ্গে তাচ্ছিল্য এবং কিছুটা ঘৃণাই যেন মিশল।

মিনিট খানেক একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকার পর মণিমোহন ঘরের মাঝখানে চলে এলেন। গম্ভীর কর্কশ গলায় বললেন, 'গেটের কাছে দাঁড়িয়ে অসভ্যের মতো চিৎকার করছিলে কেন?'

ভয়ে কাঠ হয়ে যেতে যেতে আচমকা দীপার মধ্যে কি একটা ম্যাজিক ঘটে গেল যেন। সে বুঝতে পারছিল, সমানে সমানে যুদ্ধ না করে মিইয়ে বা কুঁকড়ে থাকলে মণিমোহন তাকে গুঁড়িয়ে ফেলবেন। দুর্জয় সাহস এবং জেদ নিয়ে সে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল। সে স আবার ফিরে এল যেন। শ্বাসক্রিয়া আবার স্বাভাবিক হয়ে আসতে লাগল। ফুসফুসে অনেকখানি বাতাস টেনে দীপা বলল, 'অসভ্যের মতো চিৎকার না করলে আপনি বাড়িতে ঢুকতে দিতেন না।'

ভেতরে ভেতরে একটু থমকে গেলেন মণিমোহন। এরকম সাজগোজ এবং চেহারার একটি মেয়ে তাঁর সামনে এসে ঘাড় নুইয়ে মাটির সঙ্গে মিশে যাবে, এটাই ছিল প্রত্যাশিত। কিন্তু সে যে এভাবে মুখের ওপর জবাব দেবে, মণিমোহন ভাবতে পারেননি। বললেন, 'তুমি জানো না, অ্যাপয়েন্টমেণ্ট ছাড়া আমি কারও সঙ্গে দেখা করি না।'

'জানতাম না। আপনার দারোয়ান একটু আগে আমাকে বলেছে। অবশ্য—' কথা শেষ না করে দীপা থেমে গেল।

'অবশ্য কি?' কপাল আরও কুঁচকে গেল মণিমোহনের।

'আগে থেকে চেষ্টা করলেও আমার মতো একটা মেয়েকে অ্যাপয়েন্টমেণ্ট দিতেন কি?'

এমন মেয়ে আগে আর কখনও দেখেননি মণিমোহন।

সত্যিই তিনি একে দেখা করার সুযোগ দিতেন না। মনে মনে তিনি স্বীকার করলেন, মানুষ চেনার অপরিসীম ক্ষমতা এই মেয়েটার। দীপার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে তিনি পাল্টা প্রশ্ন করলেন, 'কি নাম তোমার?'

'আমি মার্গারেট থ্যাচার কি ইন্দিরা গান্ধীর মতো বিখ্যাত মহিলা নই যে নাম বললেই চিনতে পারবেন। তবু যখন জানতে চাইলেন তখন বলছি—আমার নাম দীপা, দীপা মণ্ডল।'

মণিমোহন বুঝতে পারছিলেন, শুধুমাত্র ব্যক্তিত্ব দিয়ে বা গম্ভীর গলায় কথা বলে এই মেয়েটি অর্থাৎ দীপাকে নোয়ানো যাবে না। তিনি বললেন, 'তুমি আমার কাছে কি চাও?'

দীপা বলল, 'ঠিক এক কথায় তা বলা যাবে না। দয়া করে আপনি যদি বসেন, আমিও বসতে পারি। তারপর আপনার কাছে আসার কারণটা জানাচ্ছি।'

দীপা যেভাবে তাঁকে বসতে বলল তাতে মনে হচ্ছে, এই বাড়ি-টাড়ি তাঁর নয়—দীপার। তিনিই এখানে দীপার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। রেগে উঠতে গিয়েও কিছুটা মজাই যেন লাগল মণিমোহনের, কিন্তু বাইরে তা ফুটে উঠতে দিলেন না। নীরস

রুক্ষ গলায় বললেন 'বসবার সময় নেই। যা বলার তাড়াতাড়ি বলে ফেল।'

'এত কথা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বলা যায় না। দয়া করে বসুন।' অত্যন্ত বিনীত ভাবেই বলল দীপা, তবু তার বলার ভঙ্গিতে কোথায় যেন খানিকটা জেদ রয়েছে।

'ঠিক আছে, ব'সো।' কব্জি উল্টে ঘড়ি দেখে নিয়ে মণিমোহন বললেন, 'দশ মিনিট সময় দিতে পারি। তার মধ্যে তোমার বক্তব্য শেষ করতে হবে।' বলতে বলতে একটা সোফায় বসে পড়লেন মণিমোহন।

যুদ্ধের প্রথম রাউণ্ডে তার জেদটা জয় হওয়াতে দীপার আত্ম-বিশ্বাস বেশ কিছুটা বেড়ে গেল। একটু দূরে আগের সেই সোফায় মণিমোহনের মুখোমুখি বসে পড়ল সে।

মণিমোহন বললেন, 'এবার বল—' পরক্ষণেই তাঁর চোখ এসে পড়ল দীপার সেই রং-ওঠা কালচে স্যুটকেশটার ওপর। দীপার সোফার পাশে কার্পেটের ওপর সেটা সন্তর্পণে দাঁড় করানো আছে।

মণিমোহন একটু অবাক হয়েই এবার বললেন, 'এ কি, স্যুটকেশ নিয়ে এসেছ কেন?' এরকম লটবহর নিয়ে কেউ কখনো কারো সঙ্গে দেখা করতে আসতে পারে, এটা তাঁর কাছে অভাবনীয়।

সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল না দীপা। স্থির চোখে এক পলক মণি-মোহনকে দেখে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিল। এবার সে আসল জায়গায় পৌঁছে গেছে। শরীরে এবং মনে যেখানে যতটুকু শক্তি এবং সাহস ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিল সব এক জায়গায় জড়ো করে দীপা আস্তে আস্তে বলল, 'আমি এখানে থাকতে এসেছি। স্যুটকেশে আমার জামা-কাপড় আছে।'

নিজের কানকেই যেন বিশ্বাস করতে পারলেন না মণিমোহন। তীব্র চাপা গলায় বললেন, 'হোয়াট্?'

দীপা ফের একই রকম কণ্ঠস্বরে বলতে লাগল, 'এখানে থাকতে এসেছি। বলতে পারেন, আমার অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে চাই।

দীপার কথা শেষ হতে না হতেই চিৎকার করে উঠলেন মণিমোহন 'অধিকার—মানে রাইট! হোয়াট ডু ইউ মীন?'

দীপা মণিমোহনের দিকে তাকাল না। চোখ নামিয়ে অনেকক্ষণ ঠোঁটে ঠোঁট চেপে শ্বাসরুদ্ধের মতো বসে রইল।

মণিমোহন অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছেন। বললেন, 'চুপ করে রইলে কেন? বল—কিসের অধিকার?'

চোখ তুলল না দীপা। মেঝের দিকে তাকিয়ে ফিস ফিস করে বলল, 'বলতে লজ্জা করছে, তবু নিজের ভবিষ্যৎ আর আপনাদের পরিবারের সুনামের জন্যে না বলে উপায় নেই।'

শরীরের সমস্ত স্নায়ু টান টান করে অপেক্ষা করতে লাগলেন মণিমোহন।

দীপা এবার বলল, 'আমার পেটে অনীশের বাচ্চা রয়েছে।'

মণিমোহনের মাথার ভেতর একটা জ্বলন্ত পেরেক ঢুকে গেল যেন। কর্কশ গলায় তিনি বললেন, 'কে অনীশ?'

'আপনার ছেলে।'

নিজের অজান্তেই মণিমোহন খাড়া দাঁড়িয়ে পড়লেন। তাঁর শরীরের রক্তচাপ হঠাৎ যেন অত্যন্ত বিপজ্জনক জায়গায় পৌঁছে গেছে। চোখের সাদা অংশে রক্ত জমাট বেঁধে যেতে লাগল। গলার শিরগুলো দড়ির মতো পাকিয়ে উঠল। অত্যন্ত হিংস্র এবং নিষ্ঠুর দেখাল মণিমোহনকে। তাঁর গলার পেশী ছিঁড়ে একটা জান্তব চিৎকার বেরিয়ে এল, 'ইমপসিবল—ইমপসিবল। আমি বিশ্বাস করি না।'

দীপাও উঠে দাঁড়িয়েছিল। বলল, 'আপনার জায়গায় আমি হলেও বিশ্বাস করতে চাইতাম না। নিজের ছেলের সম্বন্ধে এ সব কে আর বিশ্বাস করতে চায়?'

'স্টপ দিস লাই।'

দীপা যেটুকু লেখাপড়া জানে তাতে এই ইংরেজি শব্দ তিনটের মানে বুঝতে অসুবিধে হল না। সে বলল, 'আমি যা বলেছি তার

একটা বর্ণও মিথ্যে নয়। ধমকে, চিৎকার করে আপনি আমাকে থামাতে পারবেন না।'

মণিমোহনের চোয়াল পাথরের খিলানের মতো শক্ত হয়ে উঠল। দাঁতে দাঁত ঘষে গলার স্বর আরো কয়েক পর্দা চড়িয়ে দিলেন, 'ইউ ডার্টি ওম্যান, তুমি আমাকে ব্ল্যাকমেল করতে এসেছ?'

ডার্টি ওম্যান কথাটার অর্থ দীপা জানে কিন্তু ব্ল্যাকমেল শব্দটা তার সম্পূর্ণ অজানা। অপমানে তার মুখ লাল হয়ে উঠেছিল। তীব্র গলায় বলল, 'আমি বাজে নোংরা মেয়ে নই, ভদ্র পরিবারের মেয়ে।' একটু থেমে বলল, 'ব্ল্যাকমেল বলতে আপনি কি বোঝাতে চাইছেন?'

'ভয় দেখিয়ে এ বাড়িতে ঢুকতে চাইছ! কিন্তু তা হবে না।' বলতে বলতে মণিমোহনের চোখমুখ সন্দিগ্ধ হয়ে উঠল, 'কে তোমাকে এ বাড়িতে পাঠিয়েছে?'

দীপা বলল, 'কেউ না। আমি নিজেই এসেছি। ভয় দেখিয়ে আপনার পুত্রবধূ হবার কোনোরকম ইচ্ছাই আমার নেই। সেটুকু আত্মসম্মান বোধ আমার আছে। কিন্তু এখন আমি নিরুপায়।'

'এই মুহূর্তে তুমি যদি এখান থেকে বেরিয়ে না যাও, আমি পুলিস ডাকব।'

দীপা অদ্ভুত হাসল। বলল, 'ডাকতে পারেন, আমার আপত্তি নেই। এখানে আসার আগে আমিও থানায় যাবার কথা ভেবেছিলাম। পরে ভাবলাম, আপনার সঙ্গে দেখা না করে কিছু করা ঠিক হবে না। ভাবলাম, সব শুনে আপনি আমাকে বিপদ আর লজ্জার হাত থেকে বাঁচাবেন।'

মেয়েটার স্পর্ধা দেখে অবাক হয়ে গেলেন মণিমোহন। সে যদি সত্যি সত্যিই ব্ল্যাকমেলের উদ্দেশ্য নিয়ে এসে থাকে তাহলে বুঝতে হবে এমন দুঃসাহসী ক্রিমিনাল খুব কমই জন্মেছে। কিন্তু তার অকপট মুখ, কথা বলার ভঙ্গি দেখে একেক বার সংশয় হচ্ছে, মেয়েটা বোধহয় মিথ্যে বলছে না। জীবনে অসংখ্য মানুষ দেখেছেন

মণিমোহন, বিপুল তাঁর অভিজ্ঞতা। তিনি জানেন, সত্যের নিজস্ব একটা জোর আছে। কিন্তু মেয়েটা যা বলছে তা যদি আদৌ মিথ্যে না হয়? না না, ভাবনাটাকে এক ধাক্কায় মাথা থেকে বার করে দিলেন মণিমোহন। তারপর আবার যখন চিৎকার করতে যাবেন সেই সময় চোখে পড়ল, ঘরের বাইরে বেয়ারা এবং মালিরা এসে জড়ো হয়েছে। উগ্র রক্তাক্ত চোখে তাদের দিকে তাকিয়ে হাত নাড়লেন মণিমোহন, 'যাও—কি দরকার এখানে?' বলে তাঁর খেয়াল হলো, এভাবে চেঁচামেচি করা ঠিক হয়নি। এ জাতীয় নোংরা জঘন্য ব্যাপার, তা যতই মিথ্যে হোক, চাকর-বাকরদের কানে যাওয়া ঠিক না। তারা এই নিয়ে চারদিকে চাউর করে বেড়াবে।

মালি এবং বেয়ারারা ঊর্ধ্বশ্বাসে পালিয়ে গেছে। মণিমোহন আবার দীপার দিকে ফিরলেন। রাগ উত্তেজনা হিংস্রতা এবং প্রবল রক্তচাপে তাঁর মাথার ভেতরটা টগবগ করে ফুটছিল। কিন্তু এবার আর বিস্ফোরণ ঘটতে দিলেন না। প্রাণপণে গলার স্বরটা অনেকখানি নামিয়ে আস্তে আস্তে মণিমোহন বললেন, 'সিট ডাউন—' দীপা বসলে মণিমোহনও ফের মুখোমুখি বসলেন। মাথার ভেতরে যা-ই চলুক, খুব শান্ত গলায় জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমরা কোথায় থাকো?'

'ঢালীপাড়ায়।'

'মানে রেললাইনের ধারের বস্তিতে।'

'ঠিক বস্তিতে নয়। বস্তিতে ঢোকার মুখে যে গলিটা রয়েছে, অঘোর নন্দী লেন, তারই একটা বাড়িতে।'

'বাড়ির নম্বর কত?'

'তেরো।'

এত কথা যে মণিমোহন জিজ্ঞেস করছেন সেটা অকারণে নয়। তিনি বুঝতে পারছিলেন, দীপা ভয় পাবার মেয়ে নয়। তর্জন গর্জন করে বা ধমকধামক দিয়ে তাকে দমানো যাবে না। তাকে নাড়াচাড়া করতে হবে অন্যভাবে। সে জন্য তার সম্পর্কে খুঁটিনাটি অনেক কিছু জানা দরকার।

মণিমোহনের কণ্ঠস্বর এবং ব্যবহার হঠাৎ যেভাবে বদলে গেল তাতে অস্বস্তি বোধ করল দীপা। এতক্ষণ অনবরত হুমকি দেবার পর তাঁর এই নতুন চালটা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। ভেতরে ভেতরে সে খুবই সতর্ক হয়ে রইল।

মণিমোহন এবার বললেন, 'কে কে আছে তোমার?'

দীপা স্থির চোখে মণিমোহনের দিকে তাকিয়ে বলল, 'বাবা মা আর ছোট ভাই।'

'বাবা কি করেন?'

'কিছু না। একটা লোহার কারখানায় কেরানি ছিলেন। তিন বছর হল, কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে। আর কোথাও কাজ পাননি।'

'ভাই ছোট না বড়?'

'দু'বছরের ছোট।'

'সে কিছু করে?'

'না। ক্লাস এইট পর্যন্ত পড়েছিল। মাইনে দিতে না পারায় স্কুল থেকে নাম কেটে দিয়েছে। ঐ পড়াশোনায় চাকরি হয় না। এখন মস্তানি করে বেড়ায়।'

'আই সী। তাহলে তোমাদের সংসার চলে কি করে?'

'আমি ঢালীপাড়ার প্রাইমারি স্কুলে মাস্টারি করি। আর সকাল বিকেল টিউশনি। এতে কোনো রকমে চলে।'

'কতদূর পড়াশোনা করেছ?'

'কোনো রকমে হায়ারসেকেণ্ডারিটা পাস করেছি।'

'তাহলে তুমি ছাড়া রোজগার করার আর কেউ নেই।'

'না!'

মণিমোহনের হঠাৎ কিছু মনে পড়ে গেল। ব্যস্তভাবে ঘড়ি দেখে বললেন, 'তোমাকে দশ মিনিট সময় দেব বলেছিলাম। বেয়াল্লিশ মিনিট পেরিয়ে গেছে। এবার আমাকে উঠতে হবে।'

দীপা চমকে উঠল, 'আমার—আমার কি হবে?'

মণিমোহনের চোখের বাদামী তারা থেকে আগুন ছুটতে লাগল।

দাঁতে দাঁত চেপে, চাপা গলায় তিনি বললেন, 'বদমাস মেয়ে, যার ভাই মস্তান, বাবা বেকার, যারা বস্তিতে থাকে, আমি তাকে ছেলের বউ করে ঘরে তুলব! তুমি ভেবেছ কি? ব্ল্যাকমেল করার জায়গা পাওনি?'

ব্ল্যাকমেল শব্দটার মোটামুটি একটা মানে আন্দাজ করে নিয়েছিল দীপা। তীক্ষ্ণ গলায় বলল, 'আমি আপনাকে ব্ল্যাকমেল করতে আসিনি।'

'তুমি যা বলছ তার প্রমাণ কি?'

ঠোঁট টিপে কি যেন ভাবল দীপা। তারপর জোরে শ্বাস টেনে বলল, 'অনীশ বাড়ি আছে?'

মণিমোহন হকচকিয়ে গেলেন। 'তাকে—তাকে দিয়ে কি হবে?'

'দয়া করে তাকে এখানে ডাকান। আমার অবস্থার জন্য কে দায়ী, প্রমাণ করে দেব।'

'ঠিক আছে।' দীপার চ্যালেঞ্জটা প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই নিলেন মণিমোহন। একটা বেয়ারাকে ডেকে বললেন, 'ছোট সাহেবকে এখানে আসতে বল। বলবে, আমি ডেকেছি।'

দু'মিনিট পর অনীশ ড্রইংরুমে এসে ঢুকল এবং দীপাকে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। তার চোখে ভয়ের ছায়া পড়েছে।

এমনি অনীশ বেশ সুপুরুষ। মণিমোহনের মতই হাইট। তবে গায়ের রং টকটকে নয়—বাদামী। চুল ব্যাকব্রাশ-করা, নাক মুখ কাটা কাটা, চওড়া কপাল, ধারাল থুতনি। এই মুহূর্তে তাকে ফাঁদে-পড়া ইঁদুরের মত দেখাচ্ছে। ঠোঁট টিপে আড়ষ্ট ভঙ্গিতে সে দাঁড়িয়ে আছে।

দুদিক থেকে দীপা আর মণিমোহন পলকহীন অনীশকে লক্ষ্য করছিলেন। অনীশ কিন্তু সোজাসুজি কারও দিকেই তাকাতে পারছিল না। চোখের কোণ দিয়ে একবার বাবাকে, আরেকবার দীপাকে দেখছিল। বিশেষ করে দীপাকে। তাকে এ বাড়িতে বাবার সঙ্গে ড্রইংরুমে দেখবে, অনীশ কখনো ভাবতেও পারেনি।

মণিমোহন দীপার দিকে আঙুল বাড়িয়ে রুক্ষ গম্ভীর গলায় জিজ্ঞেস করলেন, 'এই মেয়েটিকে চেন ?'

অনীশ ভয় এবং অস্বাচ্ছন্দ্য কাটিয়ে ওঠার জন্য ভেতরে ভেতরে নিজের সঙ্গেই যেন প্রাণপণে যুদ্ধ করছিল। চোখে মুখে নকল বিস্ময় ফুটিয়ে স্বাভাবিক ভাবেই বলতে চাইল, 'না।' তবু গলাটা সামান্য কেঁপে গেল।

দক্ষিণ কলকাতার এই নিরিবিলি রাস্তা, মণিমোহনদের সাজানো ড্রইংরুম, বাইরের লন, বাগান—দীপার চোখের সামনে সমস্ত কিছু ঝাপসা হয়ে যেতে লাগল। পায়ের তলায় কার্পেট-মোড়া মেঝে ঢেউয়ের মত দুলতে লাগল। মুখ থেকে দ্রুত সব রক্ত নেমে যাচ্ছে তার। কিন্তু মাত্র কয়েক মুহূর্ত। তার পরেই দীপার মাথার ভেতর প্রাকৃতিক দুর্যোগের মত কিছু একটা ঘটে গেল। চোয়াল শক্ত হয়ে উঠল তার। দাঁতে দাঁত চেপে স্থির চোখে অনীশের দিকে তাকাল সে।

এদিকে মণিমোহন অনীশকে বলছিলেন, 'একে দেখওনি কোনোদিন ?'

এতক্ষণে অস্বাচ্ছন্দ্য এবং নার্ভাস ভাবটা পুরোপুরি কাটিয়ে উঠেছে অনীশ। নীরস গলায় সে বলল, 'না।'

'আই সী'—মণিমোহন এবার বললেন, 'কিন্তু এই মেয়েটি তোমার সম্বন্ধে সীরিয়াস অ্যালিগেশন এনেছে। কি বলছে জান ?'

উত্তর না দিয়ে অনীশ অপেক্ষা করতে লাগল।

গলা খাকরে মণিমোহন এবার বললেন, 'মেয়েটি বলছে, সে প্রেগনেণ্ট। এর জন্যে তোমাকে দায়ী করছে।'

প্রথমে চমকে উঠল অনীশ। তারপরেই গলার শির ছিঁড়ে চিৎকার করল, 'লাই—আটার লাই। পুরোটাই বানানো আর মিথ্যে।'

তাকিয়ে থাকতে থাকতে দীপার মনে হচ্ছিল, তার চোখের তারা ফেটে ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটবে। শিরদাঁড়া বেয়ে গলগল করে

ঘাম ছুটে যাচ্ছে। দীপা কিন্তু চিৎকার করল না। তীব্র মোচড়ে শরীরটাকে পুরোপুরি অনীশের দিকে ঘুরিয়ে তীক্ষ্ণ চাপা গলায় জিজ্ঞেস করল, 'তুমি আমাকে চেনো না? কখনও দেখনি?'

'নো—নেভার! কে আপনি?' রুক্ষ, বিরক্ত মুখে বলল অনীশ!

'মিথ্যেবাদী, নির্লজ্জ'—দীপা বলতে লাগল, 'তুমি যে আমাকে চেন, কম করে পঞ্চাশটা লোক তার সাক্ষী আছে।'

অনীশ মণিমোহনের দিকে ফিরে বলল, 'বাবা, সী ইজ এ ডেঞ্জারাস ওম্যান। আমাদের ব্ল্যাকমেল করতে এ বাড়িতে ঢুকেছে।'

মণিমোহন বললেন, 'আমারও সেই রকমই মনে হয়েছিল। তোমার মুখে শুনবার জন্যে ডেকে পাঠিয়েছি।' দীপার দিকে ফিরে দরজা দেখিয়ে বললেন, 'গেট আউট। এই মুহূর্তে এখান থেকে বেরিয়ে যাও।'

মরিয়া ভঙ্গিতে দীপা বলল, 'আমি যাব না।'

মণিমোহন বললেন, 'ধৈর্যের একটা সীমা আছে। এক মিনিটের ভেতর এখান থেকে না গেলে আমার চাকর আর দারোয়ানেরা তোমাকে লাথি মারতে মারতে বার করে দেবে।'

'বার তো করে দিতে চাইছেন। আমার পেটের বাচ্চার কি হবে?'

উত্তর না দিয়ে, লম্বা লম্বা পা ফেলে দরজার কাছে চলে গেলেন মণিমোহন। উত্তেজিত গলায় ডাকলেন, 'লছমন, তরখু সিং, লালধারী —ইধার আও।'

মুখ থেকে হুকুম খসতে না খসতেই আধ ডজন বেয়ারা-টেয়ারা দৌড়ে এল। মণিমোহন দীপাকে দেখিয়ে বললেন, 'এই আওরতের ঘাড় ধরে গেটের বাইরে বার করে দিয়ে এস।'

দীপা বলল, 'খবরদার, আমার গায়ে কেউ হাত দেবে না। আমি নিজেই যাচ্ছি।' মণিমোহনকে বলল, 'আজ আমাকে তাড়িয়ে দিলেন কিন্তু আমি আপনাদের ছাড়ব না। আমার ক্ষতি করে দিয়ে আপনার ছেলে পার পেয়ে যাবে, তা আমি কিছুতেই হতে দেব না। কিছুতেই না—'

মণিমোহন গর্জে উঠলেন, 'গেট আউট।'

নাক মুখ ঝাঁ ঝাঁ করছে দীপার। অপমানে কপালের রগগুলো যেন ছিঁড়ে যাবে। কিছুই যেন সে দেখতে পাচ্ছিল না। অন্ধের মত চক্কর খেতে খেতে ড্রইং রুমের বাইরে বেরিয়ে এল দীপা। তারপর প্রায় টলতে টলতে লন এবং বাগানের মাঝখানে নুড়ির রাস্তার ওপর দিয়ে গেটের বাইরে বেরিয়ে গেল।

কয়েক পা যেতে না যেতেই কার যেন অস্পষ্ট ডাক কানে এল দীপার, 'এ আওরত, এ আওরত—'

মুখ ফেরাতেই দীপা দেখতে পেল, মণিমোহনের নেপালী দারোয়ানটা তাকে ডাকছে। চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ মিনিট আগে যখন প্রথম সে ঐ গেটটার সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল দারোয়ানটা তাকে মোটামুটি সম্মান দেখিয়ে দিদিজী বলেছিল। কিন্তু যে মুহূর্তে মণিমোহন তাকে চূড়ান্ত অপমান করল, তখনই দারোয়ানের চোখে দীপা অনেকটা নেমে গেছে। তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে সে এখন আওরত বলে ডাকছে।

চোখাচোখি হতেই দীপার সেই পুরনো স্যুটকেশটা ফুটপাতে ছুঁড়ে দিল দারোয়ান। তখনই দীপার মনে পড়ল, স্যুটকেশটা মণিমোহন-দের ড্রইং রুমে ফেলে সে চলে এসেছিল।

কয়েক পা পিছিয়ে এসে স্যুটকেশটা তুলে নিল দীপা। তারপর আবার চলতে শুরু করল। তার মনে হচ্ছিল, আগুনের ভেতর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে যেন।

তিন

হরপ্রসাদ সরণি যেখানে ডাইনে ঘুরে একটা আঁকাবাঁকা রাস্তায় মিশেছে, সেই মোড়ের মাথায় রিক্সার স্ট্যাণ্ড। দশ বারোটা রিক্সা সেখানে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। দীপা মোড়ে এসে রিক্সায় উঠে বলল, 'ঢালী পাড়ার বস্তির কাছে চল।' রেললাইনের ধারে ওই বিশাল বস্তিটা এই অঞ্চলের বিখ্যাত জায়গা। বিখ্যাত না বলে নোটোরিয়াস বলাই হয়ত ঠিক। সবাই জায়গাটা চেনে।

রিক্সায় যেতে যেতে দু ধারের বাড়ি-ঘর লোকজন গাড়ি-টাড়ি, কিছুই চোখে পড়ছিল না দীপার। কিছুক্ষণ আগে মণিমোহনদের বাড়িতে যা যা ঘটে গেল সে-সব ভাবতে চেষ্টা করছিল সে। কিন্তু পর পর ধারাবাহিক ভাবে কিছুই যেন ধরতে পারছে না, ভাবনাটা ছিঁড়ে ছিঁড়ে যাচ্ছে। তবে সব কিছু ছাপিয়ে বার বার অনীশের মুখটা তার চোখের সামনে ফুটে উঠেছে। ধূর্ত বেড়ালের মতো সবটুকু খেয়ে গোঁফ মুছে অনীশ তার জীবন থেকে সরে পড়েছে। অথচ একদিন তাকে কি বিশ্বাসই না করেছিল! অসীম নির্ভরতায় নিজের সব কিছু তার হাতে সঁপে দিয়েছে দীপা। এর পরিণতি কি হতে পারে, একবারও চিন্তা করে দেখেনি।

কিন্তু তার পেটে যে বাচ্চা এসেছে, একটু আগে এর দায়িত্ব পুরোপুরি অস্বীকার করল অনীশ। শুধু কি তাই, অনীশ পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছে, দীপাকে সে চেনে না, এমন কি কখনও ছাখেনি পর্যন্ত। মানুষের এই বিশ্বাসঘাতকতা তার মাথার ভেতরে জ্বলন্ত পেরেকের মত বার বার বিঁধে যাচ্ছিল।

দীপা অনীশ এবং মণিমোহনকে জানিয়ে এসেছে, সহজে তাদের ছাড়বে না। কিন্তু তারা সোসাইটির একেবারে নিচের লেভেলের

মানুষ। তাদের কোনো জমকালো পারিবারিক ব্যাকগ্রাউণ্ড নেই। আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে পুলিস অফিসার, এম. এল. এ. বা মন্ত্রী খুঁজে পাওয়া যাবে না। আর অনীশরা? ওরা আছে সোসাইটির সব চাইতে উঁচু স্তরে। অগাধ টাকা ওদের, প্রচুর ক্ষমতা এবং চারিদিকে প্রচণ্ড ইনফ্লুয়েন্স। রাগ এবং উত্তেজনার ঝোঁকে দীপা ত শাসিয়ে এল কিন্তু ও ঐরকম প্রবল শক্তিমান প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে সে লড়াই চালাবে কি ভাবে? তার ক্ষমতা কতটুকু? এই অসম যুদ্ধে ওরা ইচ্ছা করলে তাকে গুঁড়িয়ে শেষ করে ফেলতে পারে। কিছুক্ষণ আগেও শিড়দাঁড়া টান টান করে দীপা অনীশ এবং মণিমোহনের সঙ্গে দাঁতে দাঁত চেপে সমানে লড়ে গেছে। কিন্তু এখন উত্তেজনা কেটে যাবার পর স্নায়ুগুলো ক্রমশ আলগা হয়ে যাচ্ছে। অনীশরা যখন স্বীকারই করল না তখন অবৈধ সন্তানের মা হয়ে চরম অসম্মান আর দুর্নাম গায়ে মেখেই কি তাকে পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে হবে? সে ত একরকম শেষ হয়ে যাওয়াই। ভেতরে ভেতরে ভীষণ ক্লান্ত আর বিপর্যস্ত বোধ করল দীপা। দু হাতে মুখ ঢেকে জোরে মাথা নাড়তে নাড়তে রুদ্ধগলায় সে সামনে বলে যেতে লাগল, 'পারব না, পারব না, পারব না—'

কখন যে রিক্সাটা রেল লাইনের ধারে ঢালীপাড়া বস্তির মুখে চলে এসেছে, দীপার খেয়াল ছিল না। রিক্সাওয়ালা রিক্সাটা থামিয়ে বলল, 'মাইজী—আ গিয়া—'

আচ্ছন্নের মতো হাতের ভেতর থেকে মুখ তুলল দীপা। তারপর ভাড়া মিটিয়ে স্যুটকেশটা হাতে নিয়ে নেমে পড়ল।

দীপাদের বাড়িটা ঠিক বস্তির ভেতরে নয়। অঘোর নন্দী লেন নামের একটা সরু গলি বর্ডার লাইনের মতো মাঝখান দিয়ে চলে গেছে। সেটার একধারে কুখ্যাত ঢালীপাড়া বস্তি, আর এধারে সারি সারি পুরনো ক্ষয়াটে চেহারার সব বাড়ি। বেশির ভাগই টিনের বা টালির। দু-চারটে ইটের তৈরী একতলা যা আছে সেগুলোর বয়স যে কত, কেউ জানে না। জব চার্নকের সময়েই হয়ত ওগুলোর

ভিত কাটা হয়েছিল। এই রকম একটা বাড়িতেই আরো তিন ভাড়াটের সঙ্গে দীপারা থাকে।

ওদের ভাঙাচোরা সদর দরজার পাল্লায় প্রচুর কাঠের টুকরো এবং টিনের তাপ্পি। নিচের দিকটা জলে ক্ষয়ে ক্ষয়ে অনেকটা ফাঁক হয়ে গেছে।

কাছাকাছি আসতেই দীপা দেখতে পেল, মা সদরের বাইরে দাঁড়িয়ে আছে।

দীপার মা কমলার বয়স পঞ্চান্ন-ছাপ্পান্ন। একসময় বেশ সুন্দরীই ছিল মহিলা। এখন সারা শরীর জুড়ে শুধু ধ্বংসের ছাপ। গায়ের রং কবেই জ্বলে গেছে। গাল ভেঙে চোয়ালের হাড় ঠেলে বেরিয়েছে। চোখদুটো ইঞ্চিখানেক গর্তে ঢোকানো। চুল উঠে উঠে কপালটা একেবারে মাঠ।

এই মুহূর্তে কমলার পরনে মিলের আধময়লা লাল-পাড় শাড়ি আর সাদা জামা। শির বার-করা সরু সরু দুই হাতে দু গাছা লোহা ছাড়া সমস্ত শরীরে ধাতুর চিহ্নমাত্র নেই। অবশ্য লোহার সঙ্গে সধবার লক্ষণ হিসেবে দুটো শাঁখাও রয়েছে।

কমলা চাপা নীচু গলায় জিজ্ঞেস করল, 'কি হল ওখানে?' তার কণ্ঠস্বরে ভয় এবং উৎকণ্ঠা জড়ানো।

দীপা উত্তর দিল না, আচ্ছন্নের মতো মায়ের পাশ দিয়ে বাড়ির ভেতর ঢুকে সোজা নিজের ঘরে চলে এল।

এ বাড়িতে সবসুদ্ধু খান ছয়েক ঘর। ছিরিছাঁদহীন ব্যারাক-বাড়ির ঘরের মতো এগুলোও পর পর তোলা হয়েছে। সামনে দিয়ে টানা চওড়া বারান্দা।

বাঁ দিকে বারান্দায় শেষ মাথার ঘর দু'খানা দীপাদের। তার পরের দুটো ঘর নিয়ে থাকে প্রাইভেট ফার্মের এক কেরানী—উমাপদ, তার স্ত্রী শিবানী এবং তাদের দুটো ছোট ছোট বাচ্চা। উমাপদর পরের ঘরটায় থাকে এক মধ্যবয়সী নার্স—বিভা। সে একা নির্ঝঞ্ঝাট মানুষ, মা-বাবা ছেলেপুলে বা খুব ঘনিষ্ঠ আত্মীয়স্বজন বলতে তার

কেউ নেই। বিভার পাশের ঘরটা এক হিন্দুস্থানী হকারের। নাম রাজেশ্বর সিং, বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। খুব ছোট্ট সংসার রাজেশ্বরের। স্বামী আর স্ত্রী মিলিয়ে মাত্র দু'জন। স্ত্রী গঙ্গা বাঁজা বলে বাচ্চা-কাচ্চার ঝামেলা নেই। রাজেশ্বর সারা সকালটা বাঁধা খদ্দেরদের বাড়ি বাড়ি খবরের কাগজ দেয়। তারপর বাকি দিন গড়িয়াহাটায় নানারকম ম্যাগাজিন-ট্যাগাজিন বেচে। ওখানে এক বাড়ির দেওয়ালে তার ছোটখাটো একটা স্টল আছে। সব মিলিয়ে এ বাড়িতে মোটমাট চার ভাড়াটে।

টানা বারান্দার নিচে এক ফালি চাতাল। চাতালটা বহুকাল আগে সিমেন্ট দিয়ে বাঁধানো হয়েছিল। এখন ফেটে চাকলা চাকলা সিমেন্ট উঠে ভেতরের মাটি বেরিয়ে পড়েছে। ফাটা জায়গাগুলোতে জমে আছে শুকনো শ্যাওলার পুরু আস্তর, আর গজিয়েছে ঘাস।

চাতালটার ডান দিকে টালি-দেওয়া পর পর চারটে রান্নাঘর, বাঁ দিকে কর্পোরেশনের কল, স্নান-টান করার জন্য খানিকটা ঘেরা জায়গা আর দুটো পায়খানা। এগুলো সবই এজমালি।

এই মুহূর্তে বাড়িতে লোকজন বেশি নেই। উমাপদ, রাজেশ্বর এবং বিভাকে এ সময়টা কখনই পাওয়া যায় না, যে যার কাজে বেরিয়ে যায়। আর দীপার ভাই পিণ্টুর সঙ্গে বাড়ির সম্পর্ক সামান্যই। দু-বেলা খাওয়া আর রাত্তিরে ঘুমের সময়টুকু বাদ দিলে সারা দিনই সে বাইরে বাইরে থাকে। ন'টার পর থেকে বাড়িটা চলে যায় মেয়েদের দখলে।

এখন শিবানী আর গঙ্গাকে রান্নাঘরে দেখা যাচ্ছে। তারা খুবই ব্যস্ত। বারান্দায় শিবানীর বাচ্চাদুটো হুটোপাটি করছে। আর বাঁ দিকের শেষ প্রান্তে একটা হাতল-ভাঙা খাটো চেয়ারে বসে খবরের কাগজ পড়ছে দীপার বাবা আদিনাথ।

আদিনাথের বয়স ষাট-বাষট্টি। কোনো একসময় লম্বা-চওড়া সুপুরুষ চেহারা ছিল তার। এখন শরীর-টরীর ভেঙে-চুরে একেবারে

ধ্বংসস্তূপ হয়ে দাঁড়িয়েছে। পরনে রং জ্বলে যাওয়া লুঙ্গি আর তালিমারা হাফশার্ট।

দীপাকে তার ঘরে ঢুকতে দেখে হাতের কাগজ একপাশে রেখে শশব্যস্তে উঠে দাঁড়াল আদিনাথ।

এদিকে কমলাও মেয়ের পেছন পেছন ঘরের ভেতর চলে এসেছিল। এই পুরনো ভাঙাচোরা বাড়িটার যা হাল তার সঙ্গে দীপার এই ঘরটা একেবারেই খাপ খায় না। ঘরটা ছিমছাম, চমৎকার সাজানো। একধারে তক্তাপোষে ধবধবে বিছানা, আরেক দিকে ছোট একটা আলমারি। সাজবার জন্য ড্রেসিং টেবল নেই। তবে দেয়ালে একটা চৌকো ঝকঝকে আয়না লাগানো রয়েছে, সেটার সঙ্গে সুদৃশ্য কাঠের তাক জুড়ে দেওয়া হয়েছে। তাকে আছে টুকিটাকি ক'টা প্রসাধনের জিনিস—পাউডার, চিরুনি, ছোট একটা সেন্টের শিশি, ক্রিমের কৌটো, কুমকুম, ইত্যাদি ইত্যাদি। একপাশে একটা ছোট পড়ার টেবলও রয়েছে, টেবলটার ওপর সুতোর ফুল-তোলা সুন্দর টেবল ক্লথ। টেবলে রয়েছে মাটির সুদৃশ্য ফুলদানি, কলম, একটা চৌকো টেবল ক্লক আর ধূপদানি। দেয়াল কেটে র‍্যাক বসিয়ে রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্র এবং শরৎচন্দ্রের কিছু বই ব্রাউন পেপারের মলাট দিয়ে সাজিয়ে রাখা হয়েছে।

কমলা বলল, 'অনীশদের ওখানে কি হয়েছে, বললি না ত?'

দীপা এবারও উত্তর দিল না। হাতের সুটকেশটা মেঝেতে নামিয়ে রেখে নিজেকে একরকম বিছানায় ছুঁড়েই দিল সে এবং বালিশে মুখ গুঁজে চুপচাপ পড়ে রইল।

কমলা আবার বলল, 'অনীশদের বাড়ি যাবার সময় বলেছিলি ফিরবি না। তাহলে—' কথা শেষ না করেই থেমে গেল সে।

কমলার না-বলা কথার মধ্যে অনুচ্চারিত একটা প্রশ্ন ছিল। সেটা বুঝতে অসুবিধা হয় না দীপার। তবু সে চুপ করেই থাকে। যেভাবে কিছুক্ষণ আগে দাঁতে দাঁত চেপে প্রবল ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মণিমোহনের সঙ্গে সে যুদ্ধ করেছে তাতেই তার সবটুকু শক্তি শেষ।

এই মুহূর্তে কথা বলতে ইচ্ছা করছে না তার। এমন কি কারও সঙ্গেই ভাল লাগছে না।

কমলা তক্তাপোষের কাছে এসে দাঁড়াল। অনেকটা ঝুঁকে জিজ্ঞেস করল, 'ওদের সঙ্গে দেখা হয়নি ?'

মা যেভাবে একটানা ঘ্যান ঘ্যান করে চলেছে তাতে কতক্ষণ আর মুখ বুজে থাকা যায় ! অবশ্য মাকে দোষও দেওয়া যায় না। তার সম্পর্কে মায়ের উৎকণ্ঠা এবং দুর্ভাবনা তো থাকবেই। অনিচ্ছা সত্ত্বেও দীপা এবার বলল, 'হয়েছে।'

'তবে ?'

'তোমার কি ধারণা, ওরা আমাকে বরণ করে ঘরে তুলে নেবার জন্যে হাত ধুয়ে বসে ছিল ?'

শ্বাস টানার মতো শব্দ করে কমলা বলল, 'কিন্তু তুই তো ওখানে থাকার জন্যেই গিয়েছিলি।'

দীপা বালিশ থেকে মুখ না তুলেই বলল, 'হ্যাঁ, গিয়েছিলাম। নিজের সম্মান আর ভবিষ্যতের জন্যে আমাকে তো চেষ্টা করতেই হবে। কিন্তু—'

'কিন্তু কি ?'

'তুমি কি জানো—' দীপা বলতে লাগল, 'ওদের বাড়িতে কত চাকরবাকর আর দারোয়ান আছে !'

কমলা বলল, 'থাকতেই পারে। তুই ত বলেছিস, ওরা খুব বড়লোক।'

একটু চুপ করে থাকল দীপা। তারপর বলল, 'চাকর-দারোয়ান ডেকে অনীশের বাবা আমাকে বাড়ি থেকে বার করে দিয়েছে।'

শঙ্কিত মুখে কমলা জিজ্ঞেস করল, 'চাকরেরা তোর গায়ে হাত তুলেছে নাকি ?'

'নিজের থেকে না বেরিয়ে এলে তুলত।'

দরজার বাইরে একটা চাপা ফ্যাসফেসে গলা শোনা গেল,

'হারামীদের এতবড় আস্পর্ধা! আমার মেয়ের গায়ে হাত তুললে চামড়া গুটিয়ে দিয়ে আসতাম।'

আদিনাথের গলা। মুখ না তুলেও দীপা টের পেল, বাবা বারান্দার কোণ থেকে উঠে এসে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে।

আদিনাথের এই আস্ফালনের দাম কানাকড়িও। দীপা জানে, দুর্বল ভীরুর পাল দূর থেকেই চোটপাট করে। কাছে যাবার সাহস তাদের নেই। নইলে দীপার এমন মারাত্মক ক্ষতির কথা জানবার পরও বাড়িতে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকত না আদিনাথ। দৌড়ে গিয়ে অনীশের টুঁটি ধরে টেনে এনে ম্যারেজ-রেজিস্ট্রারের কাছে চলে যেত। এ সব না করে বাড়িতে বসেই সে শুধু চেঁচামেচি করছে।

কমলাও জানে, তার স্বামীর দৌড় কতটা। তার কথার উত্তর না দিয়ে দীপাকে জিজ্ঞেস করল, 'অনীশ তখন ও বাড়িতে ছিল?'

দীপা বলল, 'ছিল। তার সামনেই তো ওর বাবা আমাকে অপমান করল।'

কমলা চমকে উঠল, 'অনীশ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব দেখল? বাপকে কিছু বলল না!'

'কিছু না। উল্টে জানাল, সে আমাকে চেনে না। কোনো জন্মে দেখেনি। ভয় দেখিয়ে আমি নাকি ওদের বাড়িতে ঢুকতে চাইছি।

বাইরে চাপা হিংস্র গলায় গর্জে উঠল আদিনাথ, 'বিশ্বাসঘাতক— জানোয়ার।'

কমলা আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিল না। তার পায়ের জোর যেন আলগা হয়ে যাচ্ছিল। মাথাটা ভয়ানক টলছিল। আবছা গলায় বলল, 'এতবড় সর্বনাশ করার পর এমন কথা বলতে পারল অনীশ! মুখে বাধল না!'

দীপা কিছু বলল না। হঠাৎ সে টের পেল, চোখের মণি ফাটিয়ে জলের স্রোত বেরিয়ে আসছে।

দীপার পিঠে একটা হাত রেখে কমলা খুব আস্তে করে ডাকল, 'বন্না—'

দীপা অনুভব করল, মায়ের হাতটা ভয়ানক কাঁপছে। তার ছোঁয়ার মধ্যে ভয় উদ্বেগ মমতা, এমনি কত কি যে মেশানো। সে বলল, 'কি বলছ মা?'

কমলা বলল, 'এখন কি করবি তুই? ওরা তোকে এভাবে তাড়িয়ে দিল!'

অনীশদের বাড়ি থেকে ফিরে আসার পর দীপা এতই বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে যে কোনো কিছুই স্পষ্ট করে ভাবার শক্তিটুকু পর্যন্ত অবশিষ্ট নেই। পেটের বাচ্চাটাকে নিয়ে সে কি করবে, তার গর্ভবতী হবার খবরটা জানাজানি হবার পর লোকে তার গালে কি পরিমাণ চুনকালি মাখাবে, তার জন্য কতটা অসম্মান এবং দুর্নাম অপেক্ষা করছে— এই মুহূর্তে এসব চিন্তা করতে পারছে না দীপা। মায়ের কথায় মাথার ভেতর প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটে গেল যেন। শিরদাঁড়ার ভেতর দিয়ে বিদ্যুৎ চমকের মতো কিছু ওঠা-নামা করতে লাগল। আচমকা উদ্‌ভ্রান্তের মতো মুখটা বালিশে ঘষতে ঘষতে সে চিৎকার করে উঠল, 'যাও তোমরা, যাও। আমার কিচ্ছু ভাল লাগছে না—কিচ্ছু ভাল লাগছে না।'

কমলা আর দাঁড়াল না। ভয়ে ভয়ে মেয়ের দিকে একবার তাকিয়ে দ্রুত ঘরের বাইরে বেরিয়ে গেল।

মুখ না ফিরিয়ে দীপা টের পেল, বাবাও দরজার পাশ থেকে সরে গেছে।

অনেকক্ষণ পর অস্থিরতা কমে এল দীপার। উত্তেজিত স্নায়ুগুলো ক্রমশ শান্ত হয়ে আসছে। আস্তে আস্তে মুখ তুলল সে। থুতনিটা বালিশে ডুবিয়ে দূরমনস্কর মতো সামনের জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল।

জানালার গা ঘেঁষে একটা নিমগাছ। নিচে কিছু আগাছা, ভাঙা ইটের টুকরো, কাচের টুকরো, নানা রকমের জঞ্জাল ইত্যাদি। তার

পরেই ভাঙাচোরা পাঁচিল। পাঁচিলের পব সরু গলি। গলি পেরিয়ে এ অঞ্চলের বিখ্যাত ঢালীপাড়ার বস্তি। বস্তির মুখে দু-তিনটে মুদি দোকান, পান-বিড়ির দোকান, আর আছে চায়ের স্টল। এই স্টলগুলোর সামনে কাঠের বেঞ্চে চিরস্থায়ী একটি ভিড় সাবাক্ষণ অনড় হয়ে থাকে। দিনরাত ওখানে হৈ-হল্লা, চিৎকার, খিস্তি।

চায়ের দোকানগুলো দেখে ওদের সত্যিকার চেহারা বোঝার উপায় নেই। বাইরে বিরাট উনুনে চব্বিশ ঘণ্টা চায়ের জল ফুটছে। একপাশে সাবি সারি বোয়েমে নোনতা বিস্কুট আর বাজে বেকারির রদ্দি পাঁউরুটি সাজানো। বস্তির লোকেরা এসে চা-বিস্কুটও খায়, রুটিও কেনে। আদতে এগুলো ধোকাবাজি। এদেব আসল কারবারটা সামনের দিকে নয়, পেছনে। সেখানে রয়েছে জালা বোঝাই তাড়ি আর দিশী চোলাই মদের সারি সারি বোতল।

সন্ধ্যের পর দোকানগুলোতে ভিড়টা কয়েক গুণ বেড়ে যায়। সেই সঙ্গে বাডে হল্লা এবং চিৎকার। একেক দিন মাতলামির ডিগ্রি চড়ে গেলে ছুরি মারামারি কিংবা বোমাবাজি শুরু হয়ে যায়।

বস্তিব পর রেল লাইন। তার ওধারে অনেকটা জায়গা জুড়ে রেল ইয়ার্ড। সেখানে বম্বে মাদ্রাজ পাঞ্জাব হরিয়ানা থেকে মাল বোঝাই হয়ে অগুনতি ওয়াগন আসে। সর্বক্ষণই ওখানে কয়েক শো ওয়াগন দাঁড়িয়ে থাকে। ঢালীপাড়া বস্তির সমস্ত সমস্যা এবং ঝামেলার উৎস ওই ওযাগনগুলো।

এখানে ওয়াগন ব্রেকারের তিন চারটে গ্যাং আছে। ওয়াগনের দখল নিয়ে তাদের মধ্যে প্রায় রোজ খুনোখুনি তো হচ্ছেই, তার ওপর রয়েছে রেল পুলিসের সঙ্গে প্রতি রাত্রেই এনকাউণ্টার। বোমা বাইফেল আর স্টেনগানের শব্দে তখন সমস্ত এলাকা থত্থর কাঁপতে থাকে।

এই মুহূর্তে বস্তির মাথায় যে আকাশের লম্বাটে অংশটা দেখা যাচ্ছে সেখানে এলোমেলো টুকরো টুকরো মেঘ ঘুরে বেড়াচ্ছে।

আর চোখে পড়ছে ক'টা চিল। অলস ডানা মেলে তারা বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে।

দীপা বস্তির মাথায় স্কাইলাইন, মেঘ, চিল, চায়ের দোকান—কিছুই দেখছিল না। কয়েক মাস আগের একটা রাতের ছবি তার চোখের সামনে অদৃশ্য কোনো স্ক্রীনে যেন ফুটে উঠছিল।

এ বছর মারাত্মক বর্ষা গেছে। কলকাতার আবহাওয়া অফিস জানিয়েছিল, পঞ্চাশ বছরের মধ্যে এত বৃষ্টি আর হয়নি। অর্ধ-শতাব্দীর এই রেকর্ড বর্ষণে কলকাতা একেবারে ডুবে গিয়েছিল।

জুন মাসের মাঝামাঝি সেই দিনটায় খুব সম্ভব এ বছরের সব চাইতে বেশী বৃষ্টি হয়েছিল। সকাল থেকেই পাহাড়ের মতো কালো ভারি মেঘে আকাশ ঢেকে গিয়েছিল। যত বেলা বাড়ছিল, মেঘের ভারে আকাশটা যেন ঝুলে পড়ছিল।

ভোর হতে না হতেই অল্প অল্প বৃষ্টি শুরু হয়েছে সেদিন। কিন্তু তা দেখে বিকেল পর্যন্ত বোঝা যায়নি, সন্ধ্যের সময় গোটা শহর লণ্ডভণ্ড করে অমন বিপর্যয় ঘটে যাবে।

তখন ভবানীপুরে বিকেলের দিকে একটা টিউশানি করত দীপা। আড়াইটে কি তিনটে বাজলে সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েছিল। বেরুবার মুখে কমলা বলেছিল, 'আকাশের যা অবস্থা, আজ না হয় পড়াতে না-ই গেলি।'

দীপা বলেছে, 'যে মেয়েটাকে পড়াই, আসছে সপ্তাহে তার হাফ ইয়ার্লি পরীক্ষা। এখন না গেলে চলে!'

'কিন্তু জোরে বৃষ্টি নামলে মুশকিলে পড়ে যাবি। ফিরবি কি করে?' কমলাকে বেশ চিন্তিত মনে হয়েছিল।

দীপা বলেছে, 'সকাল থেকেই তো মেঘ জমে আছে। জোরে বৃষ্টি নামার হলে এতক্ষণে নেমেই যেত। মনে হচ্ছে সারাদিনই এই রকম গুঁড়ি গুঁড়ি পড়বে।'

'বেরুবিই যখন, বেশী দেরি করিস না, তাড়াতাড়ি পড়িয়েই চলে আসিস।'

'ঠিক আছে।'

ভবানীপুরে পৌঁছুতে পৌঁছুতে চারটে বেজে গিয়েছিল। ঘণ্টা খানেকের বেশী সে তার ছাত্রীটিকে পড়ায়নি। পাঁচটি যখন বাজে, ছাত্রীর মা-ই তাকে তাড়া দিয়ে উঠিয়ে দিয়েছিল। 'আজ আর পড়াতে হবে না। শীগগির বাড়ি চলে যান। মেঘের যা চেহারা হচ্ছে, চারদিক ভাসিয়ে দেবে।'

জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে চমকে উঠেছিল দীপা। আকাশের যে রং দেখে সে বেরিয়েছিল, এর মধ্যে কখন যেন তার গায়ে কেউ আরো দশ পোঁচ আলকাতরা লাগিয়ে দিয়েছে। মেঘের পাহাড় কলকাতার ওপর আরো অনেকখানি নেমে এসেছে।

ছাত্রীর বাড়ি থেকে বেরিয়ে সবে বাস রাস্তায় এসেছে দীপা, আকাশটাকে ভেঙে-চুরে বৃষ্টি নেমে গেল, সেই সঙ্গে উল্টোপাল্টা ঝড়ো হাওয়া কলকাতার হাড় গুঁড়িয়ে দিতে দিতে চারদিকে ঘোড়া ছুটিয়ে যেতে লাগল। ব্যাগ থেকে দীপা সবে ছাতাটা খুলেছে, সঙ্গে সঙ্গে দমকা তেজী হাওয়ায় সেটার ডাটিগুলো মট করে ভেঙে গেল। দুর্যোগের হাত থেকে নিজেকে বাঁচার জন্য দৌড়ে সামনের একটা ঝোলানো বারান্দার তলায় অগুনতি লোকের মধ্যে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল সে।

তারপর দেড় দু ঘণ্টা এমন তোড়ে বৃষ্টি পড়ল যাতে দশ ফুট দূরের কিছুই প্রায় দেখা যায়নি। প্রবল ঝড় রাস্তার ধারের অনেকগুলো বিরাট বিরাট গাছ শেকড়সুদ্ধু উপড়ে এনে মাটিতে শুইয়ে দিয়েছিল।

কলকাতায় আধ ঘণ্টা মাঝারি ধরনের বৃষ্টি হলে দেড় ফুট জল জমে যায়। সেদিন যা ঘটেছিল সেটা পৃথিবীর আদিম দুর্যোগের মতো ভয়াবহ। একটানা প্রচণ্ড বৃষ্টিতে বুক সমান জল জমে গিয়েছিল। ইঞ্জিনে জল ঢুকে কয়েক শো ট্যাক্সি, বাস, প্রাইভেট কার, অটো-রিক্সা অচল হয়ে চারপাশে দাঁড়িয়ে পড়েছিল।

ঝুলন্ত বারান্দার তলায় প্রচণ্ড বৃষ্টির ছাটে অনবরত ভিজতে ভিজতে রীতিমতো ভয়ই পেয়ে গিয়েছিল দীপা। বার বার মনে

হচ্ছিল, মায়ের কথা শুনলেই ভাল করত। এত মেঘ মাথায় নিয়ে বাড়ি থেকে বেরুনো ঠিক হয়নি।

কিন্তু যা হবার তা ত হয়েই গেছে। এখন কিভাবে সে বাড়ি ফিরবে? দু-একটা বাস যা-ও জল ঠেলে ঠেলে আসছে, এক সেকেণ্ডও দাঁড়াচ্ছে না। দাঁড়ালেই বা কি! সেগুলোর পেটের ভেতর এক ইঞ্চিও ফাঁক নেই। এমন কি দরজা-জানালাতেও গুচ্ছের লোক ঝুলছে। মানুষের সেই নিরেট দেয়াল ফুঁড়ে কার সাধ্য বাসে ওঠে। বিশেষ করে তার মতো একটা মেয়ের পক্ষে এটা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার।

রাস্তার যা হাল তাতে গোটা কলকাতা একরকম অচলই হয়ে গেছে। এর মধ্যে আড়াই মাইল জল সাঁতরে বাড়ি পৌঁছুনোর কথা ভাবা যায় না। রাস্তার কোথায় ম্যানহোল খোলা আছে, কোথায় টেলিফোন বা সি. এম. ডি. এ.-র লোকেরা গর্ত খুঁড়ে রেখেছে তা-ই বা কে জানে। ইলেকট্রিকের তার ছিঁড়ে যেখানে সেখানে মরণ-ফাঁদ তৈরি হয়ে আছে। এই অবস্থায় বাড়ির দিকে যাওয়া মানে মৃত্যু প্রায় অবধারিত।

ঘণ্টা দেড়েক পর জলের তোড় কমে এসেছিল। সেই সঙ্গে হাওয়ার দাপটও। তবে একটানা ঘ্যানঘেনে বৃষ্টি পড়েই যাচ্ছিল।

এদিকে ঝুল বারান্দার তলায় দু ফুটের মতো জল জমে গেছে। বৃষ্টির ছাটে আগেই সারা শরীর ভিজে সপসপে হয়ে গিয়েছিল দীপার। মাথা থেকে, শাড়ি জামা থেকে সমানে জল ঝরছিল। হাতের আঙুলগুলো ভিজে ভিজে সিটিয়ে গেছে। ভীষণ শীত করছিল তার। জলো হাওয়ায় গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠছিল।

বৃষ্টিটা ধরে এলে ঝুল বারান্দার তলা থেকে লোকজন জল ভেঙে ভেঙে চলে যেতে শুরু করেছিল। জায়গাটা দ্রুত ফাঁকা হয়ে যাচ্ছিল।

একা এভাবে জলে-ডোবা নির্জন রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা একটা মেয়ের পক্ষে ঠিক না। তার ওপর ঝপ করে বিকেলটা ফুরিয়ে গিয়ে অন্ধকার নেমে এসেছিল।

ওদিকে আকাশে তখনও প্রচুর মেঘ। বৃষ্টিটা যে কমে এসেছিল, তার মানে এই নয়—একেবারেই থেমে যাবে। যে কোনো মুহূর্তে প্রচণ্ড উদ্যমে আবার শুরু হয়ে যাবার সম্ভাবনা রয়েছে।

ভীষণ ভয় করছিল দীপার। চটি দুটো খুলে এক হাতে ঝুলিয়ে, আরেক হাতে শাড়িটা অনেকখানি গুটিয়ে এক সময় সে জল ভাঙতে শুরু করেছিল। যতই এগুচ্ছিল, চোখে পড়েছে চারদিকে রাস্তা বলতে কিছুই নেই—সব নদী।

জলের তলায় অত্যন্ত সতর্ক ভঙ্গিতে, গর্ত-টর্ত বাঁচিয়ে পা ফেলতে হচ্ছিল দীপাকে। পাঁচ ফুট করে এগুচ্ছিল, আর অনেকটা করে জীবনীশক্তি যেন ক্ষয় হয়ে যাচ্ছিল।

আধ ঘণ্টা যাবার পর দীপার মনে হয়েছিল, আর পারবে না। হাতে-পায়ের জোড় দ্রুত আলগা হয়ে আসছিল। চারদিক ঝাপসা হয়ে যাচ্ছিল। যে কোনো মুহূর্তে ঘাড় গুঁজে, মুখ থুবড়ে সে পড়ে যাবে।

ধুঁকতে ধুঁকতে আরও খানিকটা যাবার পর হঠাৎ দীপার চোখে পড়েছিল একটা দামী প্রাইভেট কার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। ভেতরে জল ঢুকলেও গাড়িটা পুরোপুরি অচল হয়ে যায়নি।

একজন সুপুরুষ চেহারার যুবক ড্রাইভ করছিল। জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে সে বলেছে, 'আপনি কোন্ দিকে যাবেন?'

দীপা চমকে উঠেছিল। সে জানে এই জাতীয় ছোকরারা খারাপ মতলব নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। লিফট্ দেবার নাম করে গাড়িতে তুলে রেপ-টেপ করে কোথাও ফেলে দেয়। চেঁচামেচি করলে খুন, মার্ডারও করে ফেলে। দীপার মতো মেয়েকে বাড়ি বসে থাকলে ত চলে না। অনেক সময় টুইশানি করে ফিরতে ফিরতে রাতও হয়ে যায়। অনেকদিন রাত্রে প্রায় ফাঁকা রাস্তায় যখন সে বাস-টাসের জন্য দাঁড়িয়ে আছে সেই সময় নিঃশব্দে একটা দামী গাড়ি গা ঘেঁষে এসে দাঁড়িয়েছে। মুখ বাড়িয়ে চাপা গলায় কেউ বলেছে, 'উঠে আসুন না।' দীপা ভয় হয়ত পেয়েছে, তবে তা বুঝতে

দেয়নি। পা থেকে চটি খুলে, চিৎকার করে বলেছে, 'তুমি যাদের খুঁজছ আমি সেই ক্লাসের নই। জুতিয়ে তোমার গাল ছিঁড়ে দেব।'

গাড়ি আর দাঁড়ায়নি, আচমকা দারুণ স্পীড তুলে ঊর্ধ্বশ্বাসে পালিয়ে গেছে।

সেই দুর্যোগের রাতে শরীরের সবটুকু শক্তি ফুরিয়ে এলেও দীপা চেঁচিয়ে উঠতে যাচ্ছিল কিন্তু তার আগেই যুবকটি আবার বলেছে, 'দূর থেকে লক্ষ্য করছিলাম, আপনি জল ঠেলে ঠেলে এগুচ্ছেন। রাস্তা একেবারে ফাঁকা। এভাবে একা একা কোনো মেয়ের পক্ষে হেঁটে যাওয়া খুবই রিস্কি। জলের তলায় কোথায় গর্ত-টর্ত আছে, কে জানে। তা ছাড়া এই রাস্তাটা রাত্রিবেলা খুব খারাপ। অ্যান্টি-সোসাল এলিমেন্টরা সুযোগের জন্য ওত পেতে থাকে।'

যুবকটিকে খারাপ মনে হয়নি। অন্ততঃ কথায়-বার্তায় ওকে দায়িত্বশীল নাগরিকের মতো লেগেছিল—যে শুধু নিজের কথাই ভাবে না, অন্যের ব্যাপারেও চিন্তা করে। সেই দুর্যোগের রাতে, কলকাতা যখন জলের তলায় ডুবে গেছে, ফাঁকা রাস্তায় একটি বিপন্ন অচেনা মেয়েকে ফেলে যেতে তার মন সায় দেয়নি। সে এবার বলেছিল, 'নিজের সম্বন্ধে সার্টিফিকেট দিতে বাধ্য হচ্ছি। আই অ্যাম নট এ বীস্ট। আমাকে ভদ্রলোক ভাবতে পারেন। উঠে আসুন—'

দীপার দ্বিধা তখনও কাটেনি। উত্তর না দিয়ে জড়সড় হয়ে সে যুবকটির দিকে তাকিয়েই ছিল।

যুবকটি এবার বলেছে, 'অন্য সময় হলে আপনার দিকে হয়ত তাকাতামই না, কিন্তু আকাশের চেহারা দেখছেন? প্লীজ, আর দাঁড়িয়ে থাকবেন না।'

কথাগুলো শুনতে শুনতে দীপার মনে হয়েছিল, তার সম্বন্ধে যুবকটি যেন একটা নৈতিক দায়িত্ব বোধ করছে। এরপর সে আর কিছু ভাবতে পারছিল না। শুধু মনে হয়েছিল, হয়ত এক প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে আরেক বিপর্যয়ের মধ্যে গিয়ে পড়ছে।

গাড়িতে তুলে যুবকটি যদি তার গায়ে হাত দিতে চেষ্টা করে, সে ছেড়ে দেবে না। দীপাকে খুন না করা পর্যন্ত তার শারীরিক ক্ষতি করার ক্ষমতা কারও নেই। তেমন দরকার হলে মানুষের সঙ্গে এখনও সে কিছুক্ষণ যুঝতে পারবে, কিন্তু কোমর সমান জলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তিন-চার মাইল রাস্তা পাড়ি দিয়ে বাড়ি পৌঁছুন তার পক্ষে অসম্ভব।

শেষ পর্যন্ত নিরুপায় এবং মরিয়া হয়েই গাড়িতে উঠেছিল দীপা। যুবকটি কিন্তু তার অসহায়তার কোনোরকম সুযোগই নেয়নি, বরং তার আচরণ কথাবার্তা—সবই ছিল অত্যন্ত ভদ্র ও মার্জিত। তার ব্যবহারে আপত্তিকর বা ভয় পাবার মতো কিছুই ছিল না।

ফ্রন্ট সীটে নিজের পাশে দীপাকে বসতে বলেনি যুবকটি। ব্যাক-ডোর খুলে পেছনের সীটে তাকে বসিয়েছিল। বলেছিল, 'আপনি কোথায় যাবেন?'

দীপা তাদের রাস্তার নাম জানিয়েছিল।

যুবকটি বলেছিল, 'ভালই হল, আমিও ওই দিকেই যাচ্ছি। কাছাকাছিই আমাদের বাড়ি।'

দীপা উত্তর দেয়নি। সে মনে মনে ঠিকই করে নিয়েছিল, পারতপক্ষে সে নিজের থেকে যেচে কিছু বলবে না। বেশী কথা বলা মানেই খানিকটা সুযোগ দেওয়া। গাম্ভীর্যের দেওয়াল তুলে যতটা সম্ভব দূরত্ব বজায় রাখতে চেষ্টা করবে সে। অবশ্য যে মানুষ অযাচিতভাবে তাকে বিপদ থেকে বাঁচিয়েছে, বাড়ি পৌঁছে নিশ্চয়ই দীপা তাকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা এবং ধন্যবাদ জানাবে।

যুবকটি এবার বলেছে, 'গাড়ি কিন্তু জোরে চালাতে পারব না। খুব আস্তে আস্তে এগুতে হবে।'

কারণটা বুঝতে অসুবিধে হয়নি দীপার। অত জলে স্পীড তোলা অসম্ভব।

ব্যাপারটা আরো পরিষ্কার করে দিয়েছিল যুবকটি, 'চারদিকে

তাকিয়ে দেখুন, কত গাড়ি অচল হয়ে পড়ে আছে। একবার ইঞ্জিনে জল ঢুকে গেলে আমার গাড়ির অবস্থাও ওগুলোর মতোই হবে। তাহলে সারারাত গাড়িতে বসেই দু'জনকে কাটাতে হবে।' বলে সে একটু হেসেছিল।

হাল্কা চালে মজা করেই কথাটা বলেছে যুবকটি, তবু রাতভর মেঘাচ্ছন্ন আকাশের তলায় জলে-ডোবা নির্জন রাস্তায় একটি অচল গাড়িতে তার সঙ্গে রাত কাটাবার কথা ভাবতেই অদ্ভুত ভয়ে দীপার শিরদাঁড়ার ভেতর দিয়ে বরফের মতো ঠাণ্ডা স্রোত যেন বইতে শুরু করেছিল। কাঁপা গলায় সে বলেছে, 'স্পীড দেবার দরকার নেই। আপনি আস্তেই চালান। বাড়িতে পৌঁছুতে দেরি হলে আর কি করা যাবে।'

জলে ঢেউ তুলে স্টীম লঞ্চের মতো এগিয়ে চলেছে গাড়িটা। ঠাণ্ডা ভেজা বাতাস এতক্ষণ মিইয়ে ছিল, হঠাৎ আবার তার দাপট বেড়ে গিয়েছিল। আকাশটা আড়াআড়ি চিরে বিদ্যুৎ ঝলকাতে লাগল। চিনির দানার মতো হাল্কা বৃষ্টি পড়ছিল, আচমকা সেটার তোড় প্রচণ্ড বেড়ে গেল।

লক্ষ কোটি সীসের ফলা মিনিটে হাজার মাইল স্পীডে যেন নেমে আসছে আকাশ থেকে। এভাবে ঘণ্টাখানেক চললে ক'টা স্কাই-স্ক্রেপার ছাড়া গোটা কলকাতা সোজা জলের তলায় ডুবে যাবে।

গাড়ির জানালাগুলো খোলা ছিল। তার ভেতর দিয়ে উল্টো-পাল্টা জলের ছাট আসছিল। যুবকটি প্রায় চেঁচিয়ে উঠেছে, 'জানালা বন্ধ করুন।' বলতে বলতে সামনের দিকের জানালাগুলোর কাচ সে নিজেই তুলে দিয়েছিল।

আর চমকে উঠে দ্রুত হাত বাড়িয়ে পেছন দিকের জানালা বন্ধ করেছিল দীপা।

যুবকটি বলেছিল, 'এরকম বৃষ্টি পড়তে থাকলে পনেরো মিনিটের মধ্যে ইঞ্জিনে জল ঢুকে যাবে। কি যে করব তখন!' গাড়ির

ভেতরে কম পাওয়ারের যে নীলাভ বাল্বটা জ্বলছিল তার আলোয় তাকে খুবই চিন্তিত দেখাচ্ছিল।

দীপা কিছু বলেনি। তবে সে-ও খুব উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠেছিল। টের পাচ্ছিল, ভেতরকার উদ্বেগ তার চোখে-মুখেও ফুটে বেরিয়েছে।

শেষ পর্যন্ত অবশ্য ইঞ্জিনে জল ঢোকেনি। বৃষ্টিটা হঠাৎ যেভাবে প্রবলবেগে আবার পড়তে শুরু করেছিল, তাতে মনে হয়েছিল, বাকি রাতটুকু আর থামবে না। কিন্তু দশ মিনিটের মধ্যে হঠাৎই থেমে গিয়েছিল। আর যুবকটি রাস্তার জলের বিরুদ্ধে একটানা যুদ্ধ করে করে যখন ঢালীপাড়ার বস্তির কাছে চলে এসেছিল তখন একটা বেজে গেছে।

কাছাকাছি এলেও দীপাদের বাড়ি পর্যন্ত যাওয়া সম্ভব হয়নি, কেন না, ওদিকটা খুবই নীচু। দীপাদের অঘোর নন্দী লেনে তখন কম করে সাড়ে তিন ফুটের মতো জল।

যুবকটি এক জায়গায় গাড়ি থামিয়ে বলেছিল, 'আপনাদের বাড়ি এখান থেকে কত দূরে?'

দীপা বলেছিল, 'সামনের ওই রাস্তাটা ডানদিকে ঘুরে যেখানে আরেকটা রাস্তায় গিয়ে পড়েছে, সেই মোড়ের মাথায়।'

'আপনাকে এই রাস্তাটুকু জল ঠেলে হেঁটে যেতে হবে। গাড়ি নিয়ে ওদিকে যাওয়া ইম্পসিবল। ইঞ্জিনে জল ঢুকলে আমি আর বাড়ি ফিরতে পারব না।'

'না না, আপনাকে আর যেতে হবে না।' গাড়ি থেকে রাস্তায় নেমে দীপা বলেছিল, 'আমার জন্যে আপানার অনেক কষ্ট হল। কি বলে যে ধন্যবাদ দেব।'

'ধন্যবাদের কিছু নেই। কেউ বিপদে পড়লে আরেকজনকে ত পাশে এসে দাঁড়াতেই হয়।'

ভদ্র পরোপকারী এই যুবকটিকে সেই মুহূর্তে খুব ভাল লেগেছিল দীপার। বলেছিল, 'এত কাছে এলেন, অথচ বাড়ি নিয়ে যেতে পারছি না। রাস্তার যা হাল!'

যুবকটি হেসে বলেছিল, 'পরে কখনও দেখা হলে যাওয়া যাবে।'

'আচ্ছা চলি। নমস্কার।'

'নমস্কার।' বলেই হঠাৎ কিছু মনে পড়ে গিয়েছিল যুবকটির। খুব ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল সে, 'ওই দেখুন, একসঙ্গে এতটা সময় কাটালাম, অথচ কেউ কারও নাম জানি না। আমি—অনীশ চ্যাটার্জী—'

দীপা তার নাম জানিয়ে জলের ভেতর সতর্ক পা ফেলে ফেলে বাড়ির দিকে এগিয়ে গিয়েছিল।

পরের দিন একটু বেলায় যখন কাছাকাছি থানা থেকে ন'টার সাইরেন বেজে উঠেছে, সেই সময় আদিনাথ দীপার ঘরের সামনে এসে ব্যস্তভাবে ডাকাডাকি শুরু করেছিল, 'বুনা—বুনা—'

দীপার ঘুম কিছুক্ষণ আগে ভেঙেছে কিন্তু এখনও বিছানা থেকে ওঠেনি। কাল প্রচণ্ড বৃষ্টিতে ভেজার জন্য জ্বর-জ্বর লাগছিল। মাথাটা ভীষণ ভারী, কপালের দু'পাশে রগগুলো অনবরত লাফাচ্ছিল। সে ঠিকই করে রেখেছে আজ আর স্কুলে যাবে না। সারাদিন শুয়ে শুয়েই কাটিয়ে দেবে। বেলা আরেকটু বাড়লে বাবা বা পিণ্টুকে দিয়ে ইনফ্লুয়েঞ্জা ট্যাবলেট আনিয়ে খেয়ে নেবে।

শুয়ে শুয়ে অন্যমনস্কের মতো বাইরে পাঁচিলের ওধারে ঢালীপাড়া বস্তির একটানা টালির চাল, কাকেদের ওড়াউড়ি বা আকাশ দেখছিল দীপা। কাল অনেক রাত্তিরে বাড়ি ফেরার পর আর বৃষ্টি হয়নি। জলে-ধোওয়া আকাশ বেলা ন'টার রোদে ঝকঝক করছিল। আকাশের দিক থেকে নিচে তাকালেই চোখে পড়ছিল তাদের অঘোর নন্দী লেনে এবং তার আশেপাশে সব জায়গাতেই কালকের বৃষ্টির জল খানিকটা খানিকটা জমে আছে। এখানে এক দিন তোড়ে বৃষ্টি হলে, জল সরতে তিন দিন লেগে যায়।

আদিনাথের ডাকাডাকিতে ধড়মড় করে উঠে বসেছিল দীপা, 'কি বলছ?'

'একটি ছেলে তোর সঙ্গে দেখা করতে এসেছে।'

'কে ?'

'চিনি না, আগে দেখিনি। নাম বলল অনীশ।'

এই নামের কাউকে প্রথমটা চিনতেই পারেনি দীপা। পরক্ষণেই কাল রাতের সেই যুবকটির কথা মনে পড়ে গিয়েছিল। রাত্রে পৌঁছে দিয়ে সকালেই যে আবার সে চলে আসবে, এটা ভাবা যায়নি। দীপা প্রায় হকচকিয়েই গিয়েছিল। বলেছিল, 'অনীশ কোথায় ?'

'বাইরে দাঁড়িয়ে আছে।'

'এক মিনিট দাঁড়াতে বল। ঘরটা গুছিয়ে নিই।'

আদিনাথ বেশ অবাকই হয়ে গিয়েছিল, 'ছেলেটা কে রে ? চেহারা, জামা-কাপড় দেখে ভাল ফ্যামিলির মনে হচ্ছে।'

ক্ষিপ্র হাতে বিছানা তুলে একটা ধবধবে চাদর পাততে পাততে দীপা বলেছিল, 'কাল রাত্তিরে যে আমাকে পৌঁছে দিয়ে গিয়েছিল, মনে হচ্ছে সে।'

প্রচণ্ড দুর্যোগের মধ্যে কিভাবে বাড়ি ফিরেছে, কালই মা-বাবাকে জানিয়েছিল দীপা। আদিনাথ আর কোনো প্রশ্ন না করে শশব্যস্তে চলে গিয়েছিল। পেছন থেকে বলেছে, 'আমার ঘরে এনে বসিও। আমি কলতলায় যাচ্ছি।'

মুখ-টুক ধুয়ে, মা-বাবার ঘর থেকে শাড়ি-টাড়ি বদলে, মাকে অনীশের জন্য মিষ্টি আনার টাকা দিয়ে, ফের নিজের ঘরে এসে দীপা দেখল, ছোট টেবলটার পাশে একমাত্র চেয়ারটিতে বসে আছে অনীশ। আদিনাথ একধারে দাঁড়িয়ে তার সঙ্গে কথা বলছে।

দীপা আদিনাথের দিকে তাকিয়ে বলেছিল, 'মা তোমাকে ডাকছে বাবা।'

'হ্যাঁ, যাই—'

আদিনাথ চলে যেতে বিছানার এক কোণে আস্তে আস্তে বসেছিল দীপা। সে কিছু বলার আগেই হেসে হেসে অনীশ বলেছে, 'দারুণ একটা সারপ্রাইজ দিলাম ত।'

সারপ্রাইজ কথাটার মানে দীপার অজানা নয়। সে বলেছিল,

'তা দিয়েছেন। এই সকালবেলায় আপনাকে আশা করিনি।' তার চোখমুখ এবং কণ্ঠস্বর থেকে তখনও বিস্ময় কাটেনি।

'একরকম বাধ্য হয়েই আমাকে আসতে হয়েছে, বলতে পারেন।'

কিছু না বলে অনীশের মুখের দিকে জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়েছে দীপা।

অনীশ বলেছে, 'কাল রাত্তিরে বাড়ি ফিরে মনে হয়েছিল, ওভাবে রাস্তার জলের মধ্যে আপনাকে নামিয়ে দেওয়া ঠিক হয়নি। এ-দিকে স্লাম এরিয়া, জায়গাটা ভাল না। আপনাকে বাড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আসা উচিত ছিল।'

বিস্ময়টা এতক্ষণে অনেকটা থিতিয়ে এসেছিল। দীপা হাল্কা গলায় বলেছিল, 'ও, এই জন্যে আমার খোঁজ নিতে এসেছেন?'

'হ্যাঁ।' আস্তে মাথা হেলিয়েছিল অনীশ।

'কিন্তু—'

'বলুন।'

'আপনি ত আমাদের বাড়ির অ্যাড্রেস জানেন না। এলেন কি করে?'

'রাস্তাটা কাল দেখিয়ে দিয়েছিলেন। জিজ্ঞেস করে করে চলে এলাম। এটা কি খুব একটা ডিফিকাল্ট ব্যাপার?'

দীপা বলেছিল, 'রাস্তায় তো এখনও জল আছে?'

অনীশ বলেছিল, 'আছে, তবে কালকের মতো অতটা নেই। আট-ন' ইঞ্চির মত হবে।'

'গাড়ি এনেছেন নাকি?'

'না। কারা ইট পেতে দিয়েছে, তার ওপর দিয়ে আসতে অসুবিধে হয়নি।'

'এত কষ্ট করে আসার কোনো মানে হয়!' দীপা হাসতে হাসতে বলেছিল, 'বাড়ি-ঘরের চেহারা দেখে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন, আমাকে ঝড়বৃষ্টি মাথায় নিয়েই ঘোরাঘুরি করতে হয়। আমাদের মত মেয়ের কথা অত ভাবতে নেই।'

অনীশ কি উত্তর দিতে যাচ্ছিল, মিষ্টির প্লেট আর চা নিয়ে কমলা ঘরে ঢুকেছে। তার পেছন পেছন আদিনাথ।

কাপ-টাপগুলো টেবলের ওপর রেখে কমলা বলেছিল, 'একটু চা খান বাবা।'

অনীশ বিব্রতমুখে বলেছিল, 'আমি আপনার চেয়ে অনেক ছোট। আমাকে আপনি বলবেন না।'

একটু ইতস্ততঃ করে কমলা শেষ পর্যন্ত বলেছিল, 'কাল তুমি আমাদের অনেক উপকার করেছ। তোমার সঙ্গে দেখা না হলে মেয়েটার কি বিপদ যে হত! ভগবান তোমার ভাল করবেন।'

আদিনাথও গভীর কৃতজ্ঞতা জানিয়েছিল অনীশকে। রাস্তায় কত রকম লোক ঘোরাফেরা করে। কাল রাত্তিরে দীপা তাদের কারো পাল্লায় পড়লে সর্বনাশ হয়ে যেত। ভাগ্যিস অনীশের সঙ্গে দেখা হয়েছিল, ইত্যাদি ইত্যাদি।

অনীশ সবিনয়ে জানিয়েছে, বিশেষ কিছুই সে করেনি। যে কেউ এটুকু করত।

আদিনাথ বলেছে, কেউ করে না, কেউ করে না। আজকাল মনুষ্যত্ব জিনিসটা আর নেই বললেই চলে। এর মধ্যে কেউ ভাল কিছু করলে মনে হয়, মানুষ জাতটা একেবারে শেষ হয়ে যায়নি। আদিনাথকে সেই মুহূর্তে আশাবাদী দার্শনিকের মতো দেখাচ্ছিল।

অনীশের খুব অস্বস্তি হচ্ছিল। সে বলেছে, 'এ সব শুনলে আমার ভীষণ সঙ্কোচ হয়।'

আদিনাথ একটু বেশী বকে। অনীশ জানানো সত্ত্বেও তার আবেগ এবং উচ্ছ্বাসের তোড় থামছিল না।

অগত্যা কমলাকে বাধা দিতে হয়েছে, 'তুমি এখন চল। ওরা কথা বলুক।' একরকম জোর করেই স্বামীকে নিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল সে।

এরপর অবশ্য বেশিক্ষণ থাকে নি অনীশ। বড় জোর পাঁচ-সাত মিনিট। তারপর বিদায় নিয়েছিল। তাকে বাইরের

রাস্তা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে দীপা বলেছে, 'এদিকে এলে আবার আসবেন।'

'আচ্ছা।' মাথা নেড়েছিল অনীশ, 'অবশ্য কবে আসব, এক্ষুণি বলতে পারছি না।'

একটু চুপ।

তারপর অনীশই আবার বলেছে, 'এর মধ্যে আপনার সঙ্গে দেখা হবার সম্ভাবনা বোধ হয় নেই—তাই না?'

অনীশের মনোভাব বুঝতে অসুবিধা হয়নি দীপার। পলকের জন্য ভেতরে ভেতরে থমকে গিয়েছিল। পরক্ষণেই তার মনে পড়েছে, প্রচণ্ড দুর্যোগের রাতে নির্জন জলে-ডোবা রাস্তায় গাড়ির ভেতর একা পেয়েও যে তাকে রেপ তো করেই নি, এমন কি ফ্রন্ট-সীটে নিজের পাশে পর্যন্ত বসায়নি, তাকে বিশ্বাস করা যায়। এখন পর্যন্ত যতটুকু দেখা গেছে তাতে অনীশকে ভদ্র শোভন মার্জিত এবং বিনয়ীই মনে হয়েছে।

দীপা বলেছিল, 'আমি ভবানীপুরে বিকেলের দিকে টিউশানি করতে যাই। ওখান থেকে রবীন্দ্র সদনের কাছে এসে বালিগঞ্জের বাস ধরি।'

কথাগুলোর মধ্যে একটা ইঙ্গিত ছিল, সেটা বুঝতে অসুবিধা হয়নি অনীশের। সে জিজ্ঞেস করেছে, 'রোজ টিউশানিতে যান?'

'হ্যাঁ।'

'রবীন্দ্র সদনের কাছে এসে কখন ফেরার বাস ধরেন?'

'সাড়ে পাঁচটা, ছ'টায়।'

'কাইণ্ডলি ওই সময় একটু ওয়েট করবেন।'

'আচ্ছা। তবে সাড়ে সাতটার বেশি আমি বাইরে থাকি না। মা-বাবা ভীষণ চিন্তা করে।'

'ওর ভেতরেই ফিরে আসবেন।'

অনীশ চলে গিয়েছিল।

আর দীপা বাড়ির বাঁধানো চাতাল পেরিয়ে নিজের ঘরে যেতে

যেতে লক্ষ্য করেছিল, আদিনাথ কমলা আর পিন্টু বারান্দার ওধার থেকে একদৃষ্টে তার দিকে তাকিয়ে আছে। সে বুঝতে পারছিল, অনীশ সম্পর্কে ওদের অসীম কৌতূহল। যে আগের রাত্রে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে পরের দিন ফের খবর নিতে আসে তার সম্বন্ধে অগুণতি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।

দীপা দাঁড়ায়নি। কয়েক পলক ওদের দেখে সোজা নিজের ঘরে গিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়েছিল। এবং যা আন্দাজ করা গিয়েছিল তা-ই। এক মিনিটও কাটেনি, দরজার বাইরে থেকে আদিনাথের গলা ভেসে এসেছিল, 'বুনা—'

এটাই প্রত্যাশিত ছিল, কাজেই দীপা চমকে ওঠেনি। আস্তে আস্তে মুখ ফিরিয়ে দরজার কাছে মা এবং বাবাকে দেখতে পেয়েছিল সে। চোখাচোখি হতেই ওরা ঘরে চলে এসেছে। দীপা আর শুয়ে থাকতে পারেনি, হাতের ওপর ভর দিয়ে উঠে বসেছিল।

আদিনাথ এমনিতে এ ঘরে আসে না, এখন কিন্তু যে চেয়ারটায় কিছুক্ষণ আগে অনীশ বসেছিল সেখানে জাঁকিয়ে বসল। কমলাও দীপার গা ঘেঁষে বসেছে। অর্থাৎ অনীশের ব্যাপারটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে না জেনে মা আর বাবা এ ঘর থেকে নড়বে না।

কমলা একটু ইতস্ততঃ করে বলেছে, 'অনীশকে তুই কত দিন চিনিস ?'

প্রশ্নটার মধ্যে এমন কিছু ছিল যাতে মুহূর্তে স্নায়ুগুলো চকিত হয়ে উঠেছে দীপার। স্থির চোখে মায়ের দিকে তাকিয়ে সে বলেছিল, 'তোমাদের তো রাত্তিরে ফিরেই বলেছি, কালই ওকে প্রথম দেখলাম।'

মায়ের মুখচোখ দেখে মনে হয়নি, তার কথা বিশ্বাস করেছে। সে বলেছিল, 'কাল নামিয়ে দিয়ে আজই আবার চলে এল !'

বিরুদ্ধ পক্ষের ঝানু উকিলের মত উল্টো-পাল্টা প্রশ্ন করে মা এবং বাবা কি জানতে চাইছে, বুঝতে অসুবিধা হয়নি দীপার। একমাত্র রোজগেরে মেয়ে যদি প্রেম করে বসে এবং তার পরিণতি

বিয়ে পর্যন্ত গড়ায়, তখন এ বাড়িতে নিশ্চয়ই আর থাকবে না। তার মানে গোটা পরিবারটাকে অবধারিত না খেয়ে মরতে হবে। অনীশের সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার করলেও বা তাকে অনেকবার কৃতজ্ঞতা জানালেও তাদের মনে দুশ্চিন্তা এবং প্রবল ভয় ঢুকে গেছে। এটাই স্বাভাবিক।

সংসার সম্পর্কে দীপার যথেষ্ট কর্তব্যবোধ এবং মমতা। বাবা মা আর ভাইয়ের জন্য-স্কুলের পরও মুখে রক্ত তুলে তাকে টিউশানি করতে হয়। তবু মা বাবা এভাবে সন্দেহ করায় ভীষণ রেগে গিয়েছিল দীপা। রূঢ় গলায় সে বলেছে, 'কি আবার ব্যাপার ?' মায়ের দিকে ফিরে বলেছে, 'আজ চলে এলে আমি কি করতে পারি ?'

সংসারের একমাত্র প্রতিপালক এবং রক্ষক এভাবে ক্ষেপে উঠবে, আদিনাথরা ভাবতে পারেনি। মুহূর্তে তারা নিজেদের গুটিয়ে নিয়েছিল। মিনমিনে গলায় আদিনাথ বলেছিল, 'না, হঠাৎ এল কিনা—মানে আগে আসবে বলে তো শুনিনি—'

দীপা উত্তর দেয়নি।

কমলা একটু ভেবে এবার জিজ্ঞেস করেছে, 'অনীশরা কোথায় থাকে ?'

দীপা নীরস গলায় বলেছে, 'জানি না।'

'কী করে ছেলেটি ?'

মাথার ভেতরটা গরম হয়ে উঠেছিল দীপার। সে ফেটে পড়তে গিয়েও নিজেকে সামলে নিয়েছে। নিস্পৃহ ভঙ্গিতে বলেছে, 'জিজ্ঞেস করিনি।'

সন্দিগ্ধ চোখে কিছুক্ষণ মেয়েকে লক্ষ্য করে কমলা বলেছে, 'একটা ছেলে হঠাৎ বাড়ি এল। তার সম্বন্ধে কিছু জানা গেল না—' এই পর্যন্ত বলে আচমকা থেমে গিয়েছিল।

দীপা ক্ষেপে উঠেছিল, 'আবার যদি অনীশের সঙ্গে দেখা হয়, ওর তো বটেই, ওর চোদ্দ-পুরুষের খবর জেনে নেব। বলব, সব লিখে দিন, আমার মা-বাবা জানতে চেয়েছে।' একটু থেমে বলেছে, 'এত যে জানতে চাইছ, তোমাদের মতলবটা কি ?'

আদিনাথ এবং কমলা, দু'জনেই হকচকিয়ে গেছে। আদিনাথ বলেছে, 'কিসের আবার মতলব, কিচ্ছু না। কি যে বলিস তুই!'

কমলা বলেছে, 'মেয়ে বড় হলে বাপ-মায়ের সব সময় দুশ্চিন্তা। তুই যখন মা হবি তখন বুঝতে পারবি।'

মনের মধ্যে যা-ই থাক, কমলা যা বলেছে তার অনেকখানি যুক্তি আছে। দীপার উগ্র অসন্তুষ্ট ভাবটা নরম হয়ে এসেছিল। তবে সে কিছু বলেনি।

আদিনাথ অনীশ সম্পর্কে আর কোনো প্রশ্ন করেনি। সে এবার শুধু বলেছে, 'তোর শরীরটা ভাল না। এখন শুয়ে থাক, আমি ইনফ্লুয়েঞ্জা ট্যাবলেট নিয়ে আসছি। চল গো—' কমলাকে সঙ্গে করে সে বেরিয়ে গিয়েছিল।

ওরা চলে যাবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকেছিল পিন্টু। একটা ভুরু ওপরে তুলে, আরেকটা ভুরু নিচে নামিয়ে আস্তে আস্তে মাথাটা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বলেছিল, 'দিদি, তুই টেরিফিক।'

চোখ কুঁচকে ভাইকে দেখতে দেখতে দীপা বিরক্ত মুখে বলেছিল, 'কিসের টেরিফিক?'

'গুরু, ডুবে ডুবে বেশ ওয়াটার খাচ্ছিলে। এতদিনে ক্যাচ হয়ে গেলে।' ঠোঁটে ঠোঁট টিপে হাসতে শুরু করেছিল পিন্টু।

পিন্টুর ইঙ্গিতটা বুঝতে অসুবিধা হয়নি দীপার। সে ঝাঁঝিয়ে উঠেছে, 'কিসের ওয়াটার? কিসের ক্যাচ?'

'বুঝে-সুঝেও নকশা করছ গুরু?'

গলার স্বর আরেক পর্দা চড়িয়ে দীপা বলেছে, 'একেবারে ইয়ার্কি করবি না। ভাগ এখান থেকে।'

পিন্টু তার কথা গ্রাহ্যই করেনি। দীপার ঘর থেকে চলে যাবার কোনো রকম ইচ্ছাও ছিল না তার। চোখ নাচিয়ে নাচিয়ে সে বলেছে, 'তোর টেস্ট আছে দিদি।'

গলাটা আরও কয়েক পর্দা চড়িয়ে দীপা বলেছিল, 'গেলি এখান থেকে!'

'যাচ্ছি বাবা, যাচ্ছি। তবে গুরু, একটা কথা বলে যাই—' এই পর্যন্ত বলে ঠোঁট কামড়াতে কামড়াতে অদ্ভুত কায়দা করে পিন্টু হেসেছিল।

তার হাসি দেখে মাথার ভিতর রক্ত টগবগ করে ফুটতে শুরু করেছিল দীপার। উত্তর না দিয়ে জ্বলন্ত চোখে পিন্টুর দিকে তাকিয়ে থেকেছে সে।

পিন্টু এবার বলেছিল, 'মালটাকে যদি খেলিয়ে তুলতে পারিস, আমি একটা টেরিফিক জামাইবাবু পেয়ে যাব।'

'জুতিয়ে তোমার মুখ ছিঁড়ে দেব বাঁদর।' বলতে বলতে লাফ দিয়ে বিছানা থেকে নেমে পিন্টুর দিকে দৌড়ে গিয়েছিল দীপা, 'অসভ্য উল্লুক—'

কিন্তু সে কাছাকাছি যাবার আগেই কোমরটা মজাদার ভঙ্গিতে বাঁকিয়ে-চুরিয়ে সট করে বাইরে বেরিয়ে গিয়েছিল পিন্টু। সেখান থেকে গলা বাড়িয়ে বলেছে, 'কোনো হেল্প দরকার হলে বলো গুরু। অলওয়েজ আমাকে পাবে।' বলেই গলাটা টেনে নিয়ে ছুট লাগিয়েছিল।

মা বাবা আর পিন্টু যেভাবে অনীশের ব্যাপারটা নিয়ে হৈ-চৈ বাধিয়ে দিয়েছিল তাতে দীপা ঠিকই করে ফেলেছিল, তার সঙ্গে আর দেখা করবে না। রবীন্দ্রসদনের কাছে এসে অনীশের জন্য দাঁড়াবেও না। বাস পেলেই উঠে পড়বে। কিন্তু পরের দিন ভবানীপুরে টিউশানি সেরে রবীন্দ্রসদনের কাছে আসতেই দেখা গেল, অনীশ বাসস্ট্যাণ্ডে দাঁড়িয়ে আছে।

দীপাকে দেখে উজ্জ্বল হাসিমুখে অনীশ বলেছিল, 'আপনার আগেই আমি এসে গেছি।'

তক্ষুণি আদিনাথ কমলা এবং পিন্টুর মুখ দীপার চোখের সামনে মুহূর্তের জন্য ফুটে উঠেই মিলিয়ে গিয়েছিল। আড়ষ্টভাবে সে-ও হেসেছিল, 'তা-ই তো দেখছি। কতক্ষণ দাঁড়িয়ে আছেন?'

'এই মিনিট চার পাঁচেক। আসুন—'

‘কোথায় ?’

‘আসুন না—’

কিছুটা অনিচ্ছাসত্ত্বেও অনীশের সঙ্গে রাস্তা পার হয়ে ওধারে চলে গিয়েছিল দীপা। যে গাড়িটায় করে দুর্যোগের রাতে অনীশ তাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়েছে সেটা ফুটপাথের ধার ঘেঁষে দাঁড়িয়েছিল। রবীন্দ্রসদনের বাস-স্ট্যাণ্ডে গাড়ি পার্ক করা বে-আইনি, তাই এখানে ওটা রেখে ওপারে গিয়ে দীপার জন্য অপেক্ষা করেছিল অনীশ।

আগের দিন পেছনের দরজা খুলে দীপাকে ব্যাক সীটে বসতে বলেছিল অনীশ। সেদিন কিন্তু সামনের দরজা খুলে দিয়েছে, ‘উঠুন।’

ব্যাপারটা লক্ষ্য করেছে দীপা, তবে কিছু বলেনি। আস্তে আস্তে উঠে বসেছিল।

অনীশ ঘুরে গিয়ে ওপাশের দরজা দিয়ে ড্রাইভারের সীটে উঠেই স্টার্ট দিয়েছিল। ছোট্ট ঝকঝকে বিদেশী গাড়িটা তেলের মত মসৃণ ভাবে গড়াতে গড়াতে রেসকোর্সের দিকে চলে গিয়েছিল।

দীপা একটু উদ্বিগ্নভাবেই জিজ্ঞেস করেছে, ‘আমরা কোথায় যাচ্ছি বলুন তো ?’

অনীশ বলেছে, ‘বিশেষ কোনো জায়গায় নয়। ময়দানের দিকে কিছুক্ষণ বেড়িয়ে-টেড়িয়ে কোথাও বসে একটু চা খাব।’

‘আমি কিন্তু রাত্তিরে বেশীক্ষণ বাইরে থাকি না।’

‘মনে আছে। কাল বলেছিলেন, সাড়ে সাটতার মধ্যে বাড়ি ফিরে যান।’

‘হ্যাঁ।’

‘তার আগেই ফিরবেন।’

দীপা উত্তর দেয়নি। স্নায়ুগুলোকে সতর্ক রেখে অনীশের পাশাপাশি ফ্রন্ট সীটে বসেছিল সে, আর হুঁ হাঁ করে অনীশের কথার উত্তর দিয়ে যাচ্ছিল।

সেদিন বেশী দেরি করেনি অনীশ। খানিকক্ষণ বেড়িয়ে

চৌরঙ্গীর এক রেস্তোরাঁয় চা খেয়ে আটটার ঢের আগেই দীপাকে পৌঁছে দিয়েছিল।

একটা ব্যাপার দীপার চোখে পড়েছে, অঘোর নন্দী লেনে তাদের বাড়ি পর্যন্ত গাড়িটা নিয়ে যায়নি অনীশ। বেশ খানিকটা দূরে বড় রাস্তার মোড়ে তাকে নামিয়ে দিয়ে বলেছিল, 'কাল কি দেখা হবে?'

অনীশ যে এরকম কিছু বলবে, দীপার আগেই তা মনে হয়েছিল।

সে জিজ্ঞেস করেছে, 'কেন, দরকার আছে?'

'না। দরকার কিছু নেই। খানিকক্ষণ গল্প-টল্প করা যেত, এই আর কি।'

সোজাসুজি অনীশের চোখের দিকে তাকিয়ে দীপা এবার বলেছে, 'গল্প করার মত আর কেউ নেই বুঝি?

সামান্য থিতিয়ে গিয়েছিল অনীশ। ঘাড় কাত করে বলেছে, 'অনেক আছে। তবে আপনার মত কেউ নেই।'

'আমি কি অন্য সবার থেকে আলাদা?'

'এখন পর্যন্ত তাই তো মনে হচ্ছে।'

একটু চুপ করে থেকে দীপা বলেছে, 'ঠিক আছে, কাল রবীন্দ্রসদনের কাছে ওই সময় এলে দেখা হতে পারে।'

'ফাইন।'

অনীশ চলে গিয়েছিল। আর দীপা রাস্তার মোড় থেকে তাদের গলিতে ঢুকে পড়েছিল। ওখান থেকে তিন চার মিনিট হাঁটলেই তাদের বাড়ি।

পরের দিনও অনীশের সঙ্গে বিকেলে দেখা হয়েছিল। তার পরের দিনও। এবং এইভাবে প্রতিদিন।

রোজই ঘণ্টাখানেক ময়দানে বা গঙ্গার ধারে ঘুরে কোথাও চা-টা খেয়ে বাড়ির কাছে বড় রাস্তার মোড়ে দীপাকে নামিয়ে দিয়ে গেছে অনীশ।

অনীশরা কোথায় থাকে, কি করে, দীপা নিজের থেকে

কিছুই জানতে চায়নি। তবে এটা বুঝতে পারছিল, অনীশ পয়সাওলা ভাল ফ্যামিলির ছেলে। প্রচুর টাকা না থাকলে অমন ঝকঝকে ফরেন গাড়িতে রোজ ঘোরে কিভাবে? দামী দামী রেস্তোরাঁয় অত বিল দেয় কি করে?

বড়লোক লম্পট বজ্জাত ছেলেদের সম্বন্ধে দীপার পরিষ্কার ধারণা আছে। এরকম দু-একজনের পাল্লায় বেশ কয়েক বার তাকে পড়তে হয়েছে। অনেক কষ্টে, কখনও বুদ্ধি খাটিয়ে, কখনও বা স্রেফ আঁচড়ে কামড়ে এবং চিৎকার করে লোকজন জুটিয়ে নিজেকে উদ্ধার করেছে সে। কিন্তু অনীশ তাদের মত নয়। শুধুমাত্র ফ্রন্ট সীটে তাকে পাশে বসিয়ে বেড়ানো, গল্প করা এবং রেস্তোরাঁয় নিয়ে যাওয়া ছাড়া আর কিছুই করেনি অনীশ। তার গায়ে হাত দেয়নি, চুমু খায়নি বা আরও বড় রকমের ক্ষতি করতে চেষ্টা করেনি।

একটা ব্যাপার লক্ষ্য করেছে দীপা। সেই যে প্রথম দিন বলে দিয়েছিল, রাত্তিরে সাড়ে সাতটার পর সে বাইরে থাকে না, সেটা ভোলেনি অনীশ। পরে আর তাকে মনে করিয়ে দিতে হত না। সাড়ে সাতটার আগেই দীপাকে বাড়ির কাছাকাছি বড় রাস্তার মোড়ে নামিয়ে দিয়ে যেত।

মোড় পর্যন্ত এসেও গাড়ি নিয়ে অঘোর নন্দী লেনে তাদের বাড়ির সামনে কখনও যেত না অনীশ। এটা দীপার পক্ষে ভালই হয়েছে। রোজ রাত্তিরে একটা দামী গাড়ি থেকে তাকে নামতে দেখলে অঘোর নন্দী লেন এবং ওধারের বস্তির লোকজন তার সম্বন্ধে কি ভাবত, দীপা তা জানে। সেটা তার পক্ষে খুবই অস্বস্তির কারণ হত।

অনীশ হয়ত দীপার অস্বাচ্ছন্দ্যের কথা ভেবে গলির ভেতর গাড়ি নিয়ে আসত না। কিংবা অন্য যে কারণ থাকতে পারে তা এই রকম—বস্তি এরিয়ায় দামী গাড়ি ঢুকতে দেখলেই সে সবার চোখে পড়ে যেত। অনীশ খুব সম্ভব তা একেবারে চায়নি। মোটামুটি এইভাবে অনীশের মনোভাবটা আন্দাজ করেছে দীপা।

কিন্তু আরেকটা দিক তার কাছে আদৌ পরিষ্কার নয়। অনীশকে দেখে যেটুকু বোঝা গেছে তাতে তার মতো ছেলের পক্ষে দীপার মতো একটি মেয়ের দিকে ঝুঁকে পড়া বেশ অস্বাভাবিক। এর কারণ কোনোভাবেই দীপা বুঝে উঠতে পারেনি। তার মনে যথেষ্ট সংশয় ছিল, কিন্তু এটাও তো ঠিক, দিন কয়েক মেলামেশার ফলে অনীশকে ভালও লাগতে শুরু করেছিল। বিকেল হলেই ছাত্রী পড়িয়ে কখন যে রবীন্দ্রসদনের ফুটপাথে গিয়ে দাঁড়াত, নিজেরই খেয়াল থাকত না। এক দিকে সন্দেহ, আরেক দিকে প্রবল আকর্ষণ, তখন এই দুইয়ের টানা-পোড়েন চলছে দীপার মধ্যে। সে ভাবত, দেখাই যাক না অনীশ শেষ পর্যন্ত তাকে কোথায় নিয়ে যায়।

এক দিন ময়দানের দিকে বেড়াতে বেড়াতে দীপা জিজ্ঞেস করেছিল, 'একটা কথা বলব, কিছু মনে করবে না?'

ততদিনে তারা পরস্পরকে তুমি বলতে শুরু করেছে। অবশ্য এতটা ঘনিষ্ঠতার ইচ্ছা দীপার ছিল না। অনীশকে ভাল লাগলেও নিজেকে ভাসিয়ে দেবার মেয়ে সে নয়। নিজের চারপাশে অদৃশ্য সুকঠিন একটি দেওয়াল প্রথম থেকেই তুলে রেখেছে দীপা। কিন্তু অনীশ একরকম জোরজার করেই তাকে 'তুমি' বলিয়েছে। গোড়ার দিকে এভাবে বলতে আড়ষ্ট বোধ করত দীপা, পরে অবশ্য সে ভাবটা কেটে গেছে।

অনীশ বলেছিল, 'মনে করব কেন? যা বলবার বলে ফেল—'

দীপা একটু চিন্তা করে বলেছে, 'আমরা কিরকম জায়গায় থাকি, নিজের চোখেই দেখে এসেছ।'

'হ্যাঁ, দেখেছি তো।'

'ওটাকে প্রায় বস্তিই বলা যায়।'

'তাতে কি?'

উত্তর না দিয়ে দীপা বলে যাচ্ছিল, 'আমার মা-বাবা আর ভাইকেও তুমি দেখেছ।'

'হ্যাঁ, দেখেছি তো।' একটু অবাকই হয়েছিল অনীশ।

দীপা বলেছে, 'আমরা ভীষণ গরিব। বাবার চাকরি-বাকরি নেই,

পুরোপুরি বেকার। ভাইটা পড়াশোনা ছেড়ে দিয়েছে, দিনরাত চায়ের দোকানে বসে আড্ডা দেয়। লোকে বলে, মস্তান হয়ে উঠছে। এভাবে চললে কিছুদিনের মধ্যেই পুলিসের খাতায় নাম উঠে যাবে।'

চোখের সামনে নিজেদের সংসারের একটা অস্বস্তিকর ছবি টাঙিয়ে দিয়ে দীপা ঠিক কি বোঝাতে চেয়েছে, ধরা যাচ্ছিল না। অনীশের বিস্ময় বাড়ছিলই। সে বলেছে, 'এ সব শুনে কি হবে? কোনো দরকার নেই।'

'দরকার আছে।'

'মানে?'

'যার সঙ্গে মিশছ তার সব ব্যাকগ্রাউণ্ড জেনে রাখা ভাল।'

অনীশ উত্তর দেয়নি।

দীপা নিজের বুকে আঙুল ঠেকিয়ে এবার যা জানিয়েছে তা এই রকম। নিজের চারিত্রিক সুনাম এবং সেই কারণে সামাজিক সম্মান আর বিশুদ্ধ একটি শরীর ছাড়া তার কিছুই নেই। এ দুটো কোনোভাবে নষ্ট হলে সে শেষ হয়ে যাবে, বেঁচে থাকার কোনো মানেই তখন তার কাছে আর থাকবে না।

অনীশ প্রথমটা হকচকিয়ে গেছে। তারপর স্থির চোখে দীপাকে লক্ষ্য করতে করতে বলেছে, 'ক'দিন তো আমাকে দেখলে। কি মনে হচ্ছে—আমি একটা জন্তু?'

ভেতরে ভেতরে থিতিয়ে গিয়েছিল দীপা। কথাগুলো রূঢ়ই হয়ে গেছে তার। বেশ খানিকক্ষণ পর সে আস্তে আস্তে বলেছে, 'আমি তোমাকে জন্তু বলিনি। আমাদের মত গরিব ফ্যামিলির মেয়েদের অবস্থাটা কি, সেটাই শুধু জানাতে চেয়েছি।'

অনীশ উত্তর দেয়নি, একদৃষ্টে সে দীপার দিকে তাকিয়েই ছিল।

দীপা এবার বলেছে, 'একটা কথা বলতে চাই, কিছু মনে কর না।'

'মনে করব না—বল।'

'আমি তোমার সম্বন্ধে প্রায় কিছুই জানি না।'

অনীশ বলেছে, 'একটু ধৈর্য ধরে থাক। খুব শিগ্‌গিরই তোমাকে আমাদের বাড়ি নিয়ে যাব। তখন আমার সম্বন্ধে সবই জানতে পারবে। প্লীজ, শুধু ক'টা দিন সময় আমাকে দাও।'

এরপর কিছু বলার থাকে না, অগত্যা দীপা চুপ করেই থেকেছে।

এদিকে অনীশের ব্যাপারে বাড়িতে চাপা টেনশান চলছিল। যদিও সে মাত্র একদিনই এসেছিল তবু কমলা এবং আদিনাথের মনে বেশ খানিকটা দুর্ভাবনা থেকেই গেছে। অনীশ সম্পর্কে গোড়ায় গোড়ায় তারা সোজাসুজি কিছু জিজ্ঞেস করত না, তবে মা-বাবার তাকানো এবং হাবভাব দেখে টের পাওয়া যেত ওরা রীতিমত সন্দিগ্ধ আর চিন্তিত।

অনীশের সঙ্গে দেখা হবার আগে দীপার যা দৈনন্দিন রুটিন ছিল তার এতটুকু হেরফের হয়নি। তার মর্নিং স্কুল। কাঁটায় কাঁটায় সে আগে যেমন স্কুলে যেত, পরেও তাই গেছে। ফিরেছে এগারোটায়। দুপুরে খেয়েদেয়ে একটু ঘুমিয়ে আবার বেরিয়ে পড়েছে তিনটে নাগাদ। ফিরতে ফিরতে সাতটা সাড়ে সাতটা। আটটার পর এক মিনিটও সে বাইরে থাকেনি। তাকে ধরার কোনো উপায়ই ছিল না, তবু মা-বাবার সন্দেহ কিছুতেই কাটেনি। তারা যে তার চলাফেরার দিকে নজর রাখছে, সেটা টের পাওয়া যেত। স্কুল থেকেই হোক বা টিউশানি সেরে সন্ধ্যেবেলাতেই হোক, সে বাড়ি ফিরলেই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তাকে লক্ষ্য করত আদিনাথ আর কমলা। তার চোখেমুখে ওরা কি খুঁজত, কে জানে।

একদিন দীপা মাকে হঠাৎ জিজ্ঞেসই করে বসেছিল, 'তোমরা আমার দিকে তাকিয়ে কি দেখ?'

কমলা চমকে উঠে বলেছে, 'কই, কিছু না তো।'

রুক্ষ গলায় দীপা বলেছে, 'কেন বাজে কথা বলছ। দেখ, অথচ স্বীকার করবে না।'

কমলা একেবারে মিইয়ে গেছে। কোনোরকমে বলেছে, 'কি যে বলিস তার মাথামুণ্ডু নেই।' বলতে বলতে একরকম দৌড়েই রান্নাঘরে চলে গিয়েছিল।

কিন্তু এভাবে বেশীদিন লুকোচুরি চলল না। এক রবিবারের সকালে দীপা যখন তার ঘরে বসে চা খাচ্ছে, মা এসে ঘরে ঢুকেছিল। ওই সময়টা মায়ের রান্নাঘরে ব্যস্ত থাকার কথা। নিশ্চয়ই কোনো জরুরি ব্যাপার আছে, নইলে সে আসত না।

দীপা জিজ্ঞেস করেছিল, 'কিছু বলবে?'

কমলা ভয়ে ভয়ে বলেছিল, 'হ্যাঁ। কিন্তু—'

'কি?'

'বললেই তো তুই রাগারাগি করবি।'

মায়ের মুখ-চোখের চেহারা দেখে হেসে ফেলেছিল দীপা, 'আমি বুঝি সব সময় রাগ করি?'

ভরসা পেয়ে কমলা আস্তে আস্তে মেয়ের পাশে বসেছিল, 'না না, শুধু শুধু রাগ করবি কেন? সংসারের জন্যে মুখে রক্ত তুলে খাটিস, মেজাজ কি সব সময় ঠিক থাকে!'

চায়ে আলতো চুমুক দিয়ে দীপা এবার বলেছে, 'কি বলবে বল।'

কমলা তক্ষুণি উত্তর দিল না, মনে মনে বলার জন্য যেন তৈরি হতে লাগল।

'কি হল তোমার?' একটু যেন অসহিষ্ণুই হয়ে উঠেছে দীপা, 'যা টাকা দিয়েছিলাম সব খরচ হয়ে গেছে?'

ক্ষুব্ধ অভিমানের গলায় কমলা বলেছিল, 'টাকা ছাড়া তোর সঙ্গে বুঝি আর কোনো কথা থাকতে পারে না? সেদিন যা দিয়েছিলি তাতে এ মাসটা চলে যাবে। টাকার জন্যে এখন তোকে ভাবতে হবে না।' একটু থেমে বলেছে, 'তোর কাছে অন্য ব্যাপারে এসেছি।'

উৎসুক চোখে তাকিয়ে থেকেছে দীপা।

এবার দ্বিধান্বিত ভঙ্গিতে কমলা জিজ্ঞেস করেছে, 'আচ্ছা বুনা, ওই ছেলেটি তো আর এল না।'

মা যে অনীশ সম্পর্কে কিছু বলতে এসেছে, আগেই আবছা ভাবে বুঝতে পেরেছিল দীপা। আবার মনে হয়েছিল, এতদিন যখন এ নিয়ে মুখ খোলেনি তখন হয়তো কিছু না-ও বলতে পারে। সতর্ক ভঙ্গিতে কমলার দিকে তাকিয়ে সে বলেছে, 'শুধু শুধু কি করতে আসবে? অত জলঝড়ের মধ্যে রাস্তার মোড়ে নামিয়ে দিয়ে গিয়েছিল। ঠিকমতো পৌঁছুতে পেরেছি কিনা, দেখতে এসেছিল। তারপর আসার তো কোনো কারণ নেই।'

কমলা থমকে গিয়েছিল। অনীশের ব্যাপারটা দীপা যে এভাবে উড়িয়ে দেবে, সে ভাবতে পারেনি।

দীপা আবার বলেছে, 'হঠাৎ অনীশের কথা বললে যে? ওর সঙ্গে কিছু দরকার আছে?'

চমকে উঠে কমলা বলেছিল, 'না না, দরকার আবার কিসের?'

একটু চুপচাপ।

তারপর কমলা আচমকা জিজ্ঞেস করেছে, 'তোর সঙ্গে সেদিনের পর অনীশের আর দেখা হয়নি?'

দীপার রাগও হচ্ছিল, আবার যথেষ্ট মজাও পাচ্ছিল সে। দুই বিরুদ্ধ পক্ষের ঘাঘু উকিলের মতো তাদের যেন দুর্দান্ত বুদ্ধির খেলা চলছিল। চোখ কুঁচকে মাকে দেখতে দেখতে দীপা বলেছে, 'আমার সঙ্গে দেখা হয়েছে, এটা বললে তুমি কি খুশি হবে?'

কমলা হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল। অনেকক্ষণ পর করুণ মুখে বলেছে, 'ওভাবে প্যাঁচ দিয়ে বলছিস কেন? সাদা মনে জিজ্ঞেস করলাম, তার ওই উত্তর হল?'

'ঠিক আছে, সোজাসুজিই বলছি। অনীশের সঙ্গে আমার রোজই দেখা হয়।'

কমলা খুব অবাক হয়নি, এই উত্তরটাই যেন সে আশা করেছিল। দেখা হোক বা না হোক, এ ছাড়া অন্য কিছু বললে সে বিশ্বাসই করত না। পরিপূর্ণ চোখে মেয়েকে লক্ষ্য করতে করতে কমলা শ্বাসরুদ্ধের মতো জানতে চেয়েছে, 'কেমন ছেলে অনীশ?'

'এখনও বুঝতে পারিনি। পারলে তোমাকে জানিয়ে দেব।'

দীপার কাঁধে হাত রেখে কাঁপা গলায় কমলা বলেছে, 'দেখিস বুনা, আমাদের যেন সর্বনাশ না হয়ে যায়।'

এতক্ষণ দীপার সঙ্গে এক হিসেবী সন্দিগ্ধ ভীরু মেয়েমানুষ যেন কথা বলছিল। এই প্রথম সে টের পেয়েছে কমলার ভেতর থেকে তার নিজের মা বেরিয়ে এসেছে, যে সন্তানের বিপদের আশঙ্কায় অস্থির, উৎকণ্ঠিত। কমলার হাতের ছোঁয়া তার স্নায়ুর ভেতর দিয়ে হৃৎপিণ্ড পর্যন্ত যেন পৌঁছে গিয়েছিল।

দু হাতে মায়ের হাতটা জড়িয়ে ধরে বুকের ভেতর টেনে নিয়েছিল দীপা। গভীর গলায় বলেছিল, 'মা, কত কম বয়েস থেকে তুমি আমাকে একা একা রাস্তায় বেরুতে দিয়েছ। কখনো খারাপ কিছু কি দেখেছ? আমার ওপর বিশ্বাস রাখ, এমন কিছু করব না যাতে তোমাদের মাথা কাটা যায়, আর আমাকে আত্মহত্যা করতে হয়।'

মনে আছে, সেদিনই মা চলে যাবার কিছুক্ষণ বাদে পিণ্টু তার ঘরে এসেছিল। সে বলেছে, কি গুরু, কিরকম চালাচ্ছ!

বস্তির ছোকরাদের সঙ্গে দিনরাত মিশে পিণ্টুর বারোটা বেজে গেছে। কার সঙ্গে কিভাবে কথা বলতে হয়, জানে না। ভদ্রতা, সহবত—এ সবের ধার ধারে না। ভুরু কুঁচকে বিরক্ত মুখে তাকিয়েছিল দীপা, কিছু বলেনি।

ঘরের একমাত্র চেয়ারটা শব্দ করে টেনে নিয়ে বসতে বসতে পিণ্টু এবার বলেছে, 'খুব উড়ছিস দিদি।'

'উড়ছিস দিদি!' ভ্যাংচানোর ভঙ্গিতে কথাগুলো বলে ঝাঁঝিয়ে উঠেছে দীপা, 'ছোটলোক, বাঁদর—এ সব কি ধরনের কথা! বদের ধাড়ীদের সঙ্গে আড্ডা মেরে মেরে একেবারে গোল্লায় গেছিস।'

দীপার বিরক্তি বা ঝাঁঝ কিছুই গায়ে মাখেনি পিণ্টু। দুই চোখ আর দুই হাত নাচাতে নাচাতে বলেছে, 'উড়লে বলব কি বডি ফেলে শুয়ে আছিস। যাঃ বাবা!'

মুখ শক্ত হয়ে উঠেছে দীপার। দাঁতে দাঁত চেপে সে পিণ্টুকে দেখছিল।

পিণ্টু থামেনি, 'দু'দিন আগে ভিক্টোরিয়ার দিকে গিয়েছিলাম। ফুটপাথ দিয়ে হাঁটছি, সট করে চোখে পড়ল সেই মক্কেলের সঙ্গে তুই রেসকোর্সের পাশ দিয়ে একটা ফরেন কারে উড়ে বেড়াচ্ছিস।'

দীপা চমকে উঠেছে। ভেতরে ভেতরে সে বেশ গুটিয়ে গিয়েছিল। তবে সে ভাবটা বাইরে ফুটে উঠতে দেয়নি। ব্যাপারটা পুরোপুরি উড়িয়েই দিতে চেয়েছিল দীপা, 'আজে বাজে কি বলছিস!' তবে তার গলায় একটু আগের সেই ঝাঁঝ বা ক্রোধ ছিল না।

'আজে বাজে!' চোখের তারা ঘুরিয়ে দীপাকে দেখতে দেখতে বলেছিল পিণ্টু।

'না তো কি!' দীপা পিণ্টুর দিকে তাকাতে পারেনি। অবশ্য এ বাড়ির কাউকে ভয় পাবার কোন কারণই নেই। কেন না তার পয়সাতেই সংসার চলে। সবাই এ জন্য তাকে যে তোয়াজ করে, দীপা তা জানে। দীপা কিছু করলে বাধা দেবার সাহস বা শক্তি কারো নেই। তবু ছোট ভাইয়ের কাছে ওভাবে ধরা পড়ে যাওয়াতে তার খুবই অস্বস্তি হচ্ছিল। অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নখ খুঁটতে খুঁটতে সে বলেছে, 'দূর থেকে কাকে দেখতে কাকে দেখেছিস? আর সেটা আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিচ্ছিস।'

পিণ্টু চেয়ার থেকে উঠে দীপা যেদিকে মুখ ফিরিয়েছিল সেদিকে এসে কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়েছিল। তারপর ঘাড় বাঁকিয়ে মজাদার ভঙ্গি করে বলেছে, 'আমার চোখে দূরবীন ফিট করা আছে গুরু। গ্যারান্টি দিয়ে বলছি, ফরেন কারে সেই মক্কেলের পাশে তুমি ছাড়া আর কেউ ছিল না।'

দীপা উত্তর দেয়নি।

পিণ্টু এবার বলেছে, 'টেরিফিক গাড়িটা কি ওই মালের ন্যাক রে দিদি?' তার চোখ চকচকিয়ে উঠেছিল।

দীপা বলেছে, 'জানি না, যা এখান থেকে।'

পিন্টু চলে যায়নি। একটু চিন্তা করে বলেছে, 'দিদি, একটা কথা বলব ?'

দীপা আস্তে আস্তে মুখ তুলে জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়েছিল, তবে কিছু বলেনি।

পিন্টু এবার বলেছিল, 'এ বাড়ি থেকে তুই কেটে পড়।'

দীপা বিমূঢ়ের মতো বলেছে, 'কেটে পড়ব ! মানে !'

'এখানে থেকে কি করবি বল। বাবা মা আমি—সবাই তোর ব্লাড চুষে ছিবড়ে করে ফেলব। চান্স যখন একটা পেয়ে গেছিস ওই মক্কেলটার কাঁধে চেপে স্রেফ হড়কে যা।'

দীপা অবাক। কিছুক্ষণ আগেও অসভ্যতা আর বাঁদরামো করছিল পিন্টু, কিন্তু এখন তার চোখেমুখে কণ্ঠস্বরে গভীর সহানুভূতির ছাপ। সে যে খুব আন্তরিকভাবেই কথাগুলো বলেছে বুঝতে অসুবিধা হয়নি দীপার।

এই পিন্টু স্কুল-টুল ছেড়ে যখন মস্তান হয়ে উঠল, বাজে বখা ছোকরাদের সঙ্গে মিশে জাহান্নামে যেতে লাগল, তখন থেকেই তাকে ঘেন্না করে আসছে দীপা। পারতপক্ষে সে তার সঙ্গে কথা বলত না, তাকে এড়িয়ে চলত। কিন্তু তার মধ্যেও মমতা এবং ভালত্বের একটু তলানি যে এখনও অবশিষ্ট আছে---এটা দীপার কাছে একটা নতুন আবিষ্কার। তার চোখের কোণ শির শির করছিল, গলার কাছটা ভারী হয়ে উঠছিল। পিন্টুর হাত ধরে কাছে বসিয়ে কাঁপা গলায় সে বলেছিল, 'ধর আমি এ বাড়ি থেকে চলে যাব। কিন্তু তোদের কি হবে ? বাবার চাকরি নেই, তুই বেকার। সংসার চলবে কিভাবে ?'

'গুলি মার সংসার-ফংসারকে। নিজে বাঁচলে বাপের নাম। আমি তো মস্তান হয়েই গেছি, ওয়াগন ব্রেকারদের গ্যাং-য়ে ঢোকার জন্যে পা-ও বাড়িয়ে দিয়েছি। তাতে যদি কিসসু না হয়, হাতে ড্যাগার আর চেম্বার তুলে নিতে হবে।' পিন্টু এক নাগাড়ে বলে যাচ্ছিল, 'আমাদের যা হবার হবে, তুই তো ভালভাবে বাঁচ।'

দীপা উত্তর দেয়নি। অদ্ভুত আবেগে তার বুকের ভেতর ঢেউ বয়ে যাচ্ছিল।

পিণ্টু হঠাৎ জিজ্ঞেস করেছে, 'তোর ওই মক্কেলের বাড়ির ঠিকানাটা দে তো।'

দীপা চমকে উঠেছিল। ঠিকানা সে-ও জানত না, জানলেও দিত না; পিণ্টু গিয়ে কি হুজ্জুত পাকিয়ে বসবে, কে জানে। দীপা বলেছিল, 'ঠিকানা দিয়ে কি হবে?'

তার মনোভাবটা আঁচ করতে পেরেছিল পিণ্টু। সে হেসে হেসে বলেছে, 'তোর ভয় নেই দিদি। আমার মত মাকড়া ওর কাছে গেলে তোর কেস কিচাইন হয়ে যাবে। আমি যাচ্ছি না।'

পিণ্টুর এই কাণ্ডজ্ঞান ভালই লেগেছে দীপার। সে হাল্কা গলায় বলেছে, 'তাহলে ঠিকানা চাইছিস কেন?'

'বাবাকে ভাল ড্রেস-ট্রেস চড়িয়ে পাঠিয়ে দেব! তোর মক্কেলের বাবার সঙ্গে বাত পাক্কা করে আসবে। একটা কাগজে অ্যাড্রেসটা ঝট করে লিখে দে।'

দীপা এবার বিরক্তভাবে বলেছিল, 'আমি অনীশদের ঠিকানা জানি না।'

'সে কি রে! মক্কেল তোকে বাড়ি পৌঁছে দিল, ফরেন কারে ঘোরাচ্ছে, আর তার অ্যাড্রেসই জানিস না!'

'ও বলছিল, শীগগির একদিন ওদের বাড়ি নিয়ে যাবে।'

অভিজ্ঞ বয়স্ক লোকের মত এবার গম্ভীর মুখে পিণ্টু বলেছে, 'এটা ঠিক করিসনি দিদি, ওর ঠিকানাটা জানা দরকার। হয়ত মক্কেল জেণ্টলম্যান, তবু আমরা ওর সম্বন্ধে কিছুই জানি না। যদি কিছু খারাপ মতলব-ফতলব থাকে?'

পিণ্টুর গাম্ভীর্য, দূরদর্শী বিজ্ঞ মানুষের মত কথাবার্তা দীপাকে বিস্মিত করেছিল। সেদিন এই বখাটে অসভ্য ইতর ছেলেটার ভেতর থেকে সম্পূর্ণ অচেনা একটি কোমল মমতাময় সহানুভূতি-প্রবণ মানুষ যেন বেরিয়ে এসেছিল। একটা মানুষের ভেতর

কত রকম মানুষই না থাকে! দীপা কি বলবে, ভাবতে পাচ্ছিল না।

অনীশের ঠিকানাটা যেন কোনো সমস্যার ব্যাপারই না, এভাবে পিন্টু এবার বলেছে, 'ঠিক আছে, ওটা নিয়ে তোর মাথা ঘামাতে হবে না। আমি মক্কেলের পাত্তা লাগিয়ে ফেলব। কলকাতায় যখন থাকে তখন মাল যাবে কোথায়? তিনদিনের ভেতর অ্যাড্রেস নিয়ে আসব।'

তিন দিন লাগেনি, দেড় দিনের মাথায় অনীশদের বাড়ির ঠিকানা যোগাড় করে এনেছিল পিন্টু। চোখ দুটো পুরোপুরি গোল করে বলেছিল, 'এ কাকে ক্যাচ করেছিস দিদি!'

উদ্বিগ্ন মুখে দীপা জিজ্ঞেস করেছিল, 'কেন, কি হয়েছে?'

'মক্কেলদের কি বাড়ি রে গুরু, দেখলে চোখ ট্যারা হয়ে যায়। চার পাঁচটা ফরেন কারও আছে।' বলতে বলতে ভীষণ উত্তেজিত হয়ে যাচ্ছিল পিন্টু, 'আমার কি মনে হয়, জানিস দিদি?'

দীপা উৎসুক চোখে তাকিয়েছিল, 'কী?'

'ওই মালেদের ডেফিনিটলি নোট ছাপার কারখানা আছে। না হলে এমন টেরিফিক বাড়ি আর এত গাড়ি-ফাড়ি হয় কি করে?'

দীপা উত্তর দেয়নি।

পিন্টু থামেনি। সমানে বলে যাচ্ছিল সে, 'আরও অনেক খবর এনেছি দিদি। তোর ওই মক্কেলের বাবার নাম মণিমোহন চ্যাটার্জী। ব্যারাকপুর আর টিটাগড়ে ওদের অনেকগুলো ফ্যাক্টরি আছে।'

এ ছাড়া আরও প্রচুর খবর দিয়েছিল পিন্টু। পলিটিক্যাল পার্টির নেতারা ওদের বাড়ি নিয়মিত যাতায়াত করে। ইলেকশানে যে ক্যাণ্ডিডেটের জেতার সম্ভাবনা, নির্বাচনী প্রচারের সময় গোপনে তাকে টাকাও দিয়ে থাকেন মণিমোহন। এটা নাকি তাঁর ইনভেস্টমেণ্ট, পরে নানা ভাবে তিনি এর সুযোগ নিয়ে থাকেন।

দীপা চমকে উঠেছিল। মণিমোহন চ্যাটার্জীর নামটা তার আগেই শোনা। ইনিই যে অনীশের বাবা, এটা জানার সঙ্গে সঙ্গে

ভেতরে ভেতরে চাপা উদ্বেগ টের পেতে শুরু করেছিল সে। এ
বড়লোকের ছেলের সঙ্গে যোগাযোগ না হলেই হয়ত ভাল হত।

পিন্টু এবার বলেছিল, 'দিদি, তুই ভাবিস না, আসছে রবিবার
বাবাকে মণিমোহন চ্যাটার্জীর কাছে পাঠিয়ে দেব। মক্কেলের সঙ্গে
তোর মহব্বৎ যখন জমে গেছে তখন চিন্তা-ফিন্তার কিছু নেই
বস্তির মেয়ের সঙ্গে রাজার ছেলের বিয়ে! শ্লা, একখানা ফাটাফাটি
ব্যাপার হয়ে যাবে, না কি বলিস?'

দীপা শশব্যস্তে বলে উঠেছিল, 'না না পিন্টু, মা-বাবাকে এখন
কিছু বলিস না। তাড়াহুড়োর কি আছে, আর কিছু দিন যাক না।'

আসলে সেই মুহূর্তে অনীশের কথা ভাবছিল দীপা। অনীশ কথা
দিয়েছে, তাকে ওদের বাড়ি নিয়ে যাবে। যতদিন নিয়ে না যাচ্ছে
সে অপেক্ষা করতে চাইছিল।

দীপার চোখেমুখে কণ্ঠস্বরে এমন কিছু ছিল যাতে থমকে গিয়েছিল
পিন্টু। সে বলেছে, 'অল রাইট। তোর সিগন্যাল না পেলে মুখে
তালা ঝুলিয়ে রাখব।'

দীপা সতর্কভাবে বলেছে, 'অনীশের ব্যাপারটা অন্য কাউকে
বলিস না।'

'তুই আমাকে কি ভাবিস বল তো?' নিজের মাথায় আঙুল
ঠেকিয়ে পিন্টু বলেছে, 'এটার ভেতর স্ক্র্যাপ আয়রন পোরা রয়েছে?'

দীপা হকচকিয়ে গিয়েছিল।

পিন্টু এবার বলেছে, 'আরে বাবা, আমি কি ড্রাম পিটিয়ে রাস্তায়
রাস্তায় বলে বেড়াব, তোমরা শোন আমার দিদি প্রেমের হেভি
গাড্ডায় পড়ে গেছে! তোর প্রেস্টিজ নেই?'

এইভাবে মাস দেড়েক কেটেছে। তারপর আচমকা
ভবানীপুরের টিউশানিটা হাতছাড়া হয়ে গিয়েছিল। যে মেয়েটিকে
সে পড়াত, তার বাবা সাত দিনের নোটিশে মাদ্রাজে বদলি হয়ে
গিয়েছিলেন। অবশ্য এর জন্য দীপার ক্ষতি খুব একটা হয়নি।

ছাত্রীর বাবা যেদিন তাকে ট্রান্সফারের কথা বললেন তার পরদিনই কসবায় একটা টিউশানি পেয়ে গিয়েছিল দীপা। কাজেই ভবানীপুরের দিকে আর আসা হত না, একেবারে উল্টো দিকে যেতে হত।

অসুবিধে যা হয়েছিল তা হল, অনীশের সঙ্গে তার যোগাযোগটা হঠাৎ ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। আগে ভবানীপুরে টিউশানি সেরে রবীন্দ্র সদনের সামনে অনীশের জন্য অপেক্ষা করত দীপা. কিন্তু কসবায় ছাত্রী পড়িয়ে অত দূরে যাওয়া সম্ভব ছিল না। অবশ্য একদিন পড়াতে না গিয়ে সে ওখানে যেতে পারত, অনীশকে বলতে পারত রবীন্দ্র সদনের বদলে সাউথ ক্যালকাটার কোথাও যেন সন্ধ্যেবেলা সে চলে আসে, কিন্তু নতুন টিউশানি নিয়েই কামাই করতে সাহস হয়নি। এর জন্য ছাত্রীর মা-বাবা যে আদৌ খুশি হবে না, সে তা জানত।

অনীশের সঙ্গে কিভাবে যোগাযোগ করবে, দীপা ঠিক করে উঠতে পারছিল না। অবশ্য পিন্টু ওদের বাড়ির ঠিকানা যোগাড় করে এনেছে। সেখানে চিঠি লিখতে পারত দীপা, কিন্তু সে চিঠি যদি অনীশের হাতে না পড়ে অন্য কারও হাতে পড়ে? তা ছাড়া অনীশ যদি পায়ও, নিশ্চয়ই বিরক্ত হবে। কেন না সে তাকে ঠিকানা দেয়নি। নিশ্চয়ই ভাববে, দীপা পেছনে গোয়েন্দা লাগিয়ে তার খবরাখবর নিয়েছে। ফলে দীপার সম্পর্কে তার ধারণা খুবই খারাপ হয়ে যাবে।

আরও দিন কয়েক কাটার পর এক রবিবারেব দুপুরে দীপা ঠিক করেছিল, হরপ্রসাদ সরণিতে অনীশদের এমারেল্ড হাউসের সামনে দিয়ে বার কয়েক ঘোরাঘুরি করবে। হঠাৎ যদি অনীশের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়—এটাই আসল উদ্দেশ্য। দেখা হলে অবশ্য তাকে একটু অভিনয় করতে হবে। অনীশকে সে জানিয়ে দেবে, একটা জরুরি কাজে সে ও পাড়ায় গিয়েছিল এবং অনীশের সঙ্গে দেখা হওয়াটা নিতান্তই আকস্মিক ব্যাপার। ওই রাস্তায় অনীশদের

বাড়ি এটা জানার পর সে অবাক হবার ভান করবে, ইত্যাদি ইত্যাদি। মনে মনে বেশ কয়েক বার এই অভিনয়টার রিহার্সাল দিয়ে নিয়েছিল দীপা। দেখা হওয়ার সম্ভাবনা যদিও খুব কম, তবু একটা সুযোগ নিতে চেয়েছিল।

সেই দিনটা নানা ভাবে তাকে অনেকগুলো সুযোগ করে দিয়েছিল। বাবা-মা সকাল বেলাতেই দক্ষিণেশ্বরে চলে গেছে। সেখানে কি একটা উৎসব ছিল, ওদের ফিরতে ফিরতে রাত হয়ে যাবে। পিণ্টুও বাড়ি ছিল না, বন্ধুদের সঙ্গে দু'দিনের জন্য দীঘায় বেড়াতে গেছে। পাশের ঘরের উমাপদ বউ ছেলেপুলে নিয়ে গিয়েছিল শালীর ছেলের অন্নপ্রাসনে। অবশ্য রাজেশ্বর সিংরা ছিল। ভোর থেকে বেলা বারোটা পর্যন্ত খাটুনির পর দুপুরে খেয়ে-দেয়ে সে বিকেল অব্দি ঘুমোয়। একা একা তার নিঃসন্তান বউ গঙ্গা আর কি করবে, সেও শুয়ে পড়ে। বিভাও সেদিন বাড়িতে ছিল না, নার্সিং হোমে ডিউটি দিতে চলে গিয়েছিল।

দুপুরে খেয়ে-দেয়ে ভাল একটা শাড়ি পরে, পরিপাটি চুল আঁচড়ে, একটু সেণ্ট মেখে, ঘরে তালা দিয়ে বেরিয়ে পড়েছিল দীপা। সবার কাছেই একটা করে চাবি থাকে। মা-বাবা যদি তার আগেও কোনো কারণে ফিরে আসে, ঘরে ঢুকতে অসুবিধা হবে না।

বাড়িটা পেছনে রেখে অঘোর নন্দী লেনের মোড়ে আসতেই নিজের অজান্তেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিল দীপা। ওধার থেকে অনীশ আসছে।

প্রথমটা অবিশ্বাস্যই মনে হয়েছিল। পরক্ষণে আশ্চর্য এক আবেগ প্রবল স্রোতের মতো তার হৃৎপিণ্ডের ওপর দিয়ে বয়ে যেতে শুরু করেছিল। দীপা টের পাচ্ছিল, এই আধা-আধি চেনা, অনেকটাই-অচেনা যুবকটিকে কবে যেন নিজের অজান্তেই ভালবেসে ফেলেছে।

একটু পরেই অনীশ কাছে চলে এসেছে। সে বলেছিল, 'এ কি, বেরুচ্ছ নাকি? আর এক মিনিট দেরি হলে তোমার সঙ্গে দেখা হত না।'

অনীশকে দেখে খুব ভাল লাগছিল দীপার। কি এক সুখানুভূতি তার স্নায়ুগুলোকে আচ্ছন্ন করে ফেলছিল। সে বলেছে, 'চল, বাড়ি যাই।'

'তুমি কোনো কাজে যাচ্ছিলে নিশ্চয়ই।'

'তেমন কিছু জরুরি ব্যাপার নয়। এসো—'

বাড়ির দিকে যেতে যেতে অনীশ জিজ্ঞেস করেছে, 'তুমি আজকাল রবীন্দ্র সদনের কাছে যাও না কেন? আমার ওপর রাগ-টাগ করেছ?'

রবীন্দ্র সদনের সামনে না যাবার কারণটা জানিয়ে দিয়েছিল দীপা।

অনীশ বলেছে, 'ও, এই ব্যাপার। আমি ত কিছুই জানি না।'

'জানাব কি করে—বল। আমাকে কি তোমার ঠিকানা দিয়েছ?'

বিব্রতভাবে অনীশ বলেছে, 'তা অবশ্য ঠিক। তোমাকে একটা ফোন নাম্বার দেব। এবার থেকে দরকার হলে দুপুরের দিকে ওখানে ফোন কোরো।'

'আচ্ছা।' দীপা ঘাড় হেলিয়ে দিয়েছিল।

অনীশ একটু ভেবে এবার বলেছে, 'তোমার সঙ্গে কতদিন দেখা হচ্ছে না, আমার ভীষণ খারাপ লাগছিল। তাই ভাবলাম তোমাদের বাড়ি যাই।

দীপা মনে মনে বলেছে, আমারও খারাপ লাগছিল। তাই তোমার খোঁজে বেরিয়ে পড়েছিলাম। তবে মুখে কিছু বলেনি।

অনীশ আবার বলেছে, 'কসবায় কতক্ষণ পড়াও?'

'পাঁচটা, সাড়ে পাঁচটা পর্যন্ত।'

'ছ'টার সময় গোল পার্কের কাছে চলে যেতে পারি।'

'এসো।'

বাড়ি ফিরে তালা খুলে অনীশকে নিজের ঘরে নিয়ে গিয়েছিল দীপা। বলেছিল, 'দু মিনিট বসো, আমি আসছি।'

অনীশ বলেছিল, 'নিশ্চয়ই মিষ্টি-টিষ্টি আনতে যাচ্ছ ?'

সেই রকমই ইচ্ছে ছিল দীপার। সে বলেছে, 'এই মানে—'

'মানে-টানের দরকার নেই। এইমাত্র ভাত খেয়ে এসেছি, মিষ্টি আনতে হবে না।'

'চা করে আনি ?'

'কিচ্ছু করতে হবে না। প্লীজ তুমি বসো।'

প্রায় জোর করেই দীপাকে বসিয়ে দিয়েছিল অনীশ। তারপর বলেছে, 'বাড়িটা ভীষণ চুপচাপ দেখছি। কেউ নেই নাকি ?'

'না।'

মা-বাবা পিন্টু এবং বাড়ির অন্য ভাড়াটেরা কে কোথায় গেছে, সব জানিয়েছিল দীপা।

সেই দুপুরবেলায় চারপাশ আশ্চর্য নিঝুম। বাইরে দেয়ালের গা ঘেঁষে নিমগাছের ডালে একজোড়া শালিক অনবরত খুনসুটি করে চলেছে। কোথায় যেন থেকে থেকেই ঘুমন্ত গলায় একটা কাক ডেকে উঠছিল। শালিকের কিচির-মিচির আর কাকের ডাক দুপুরের নির্জনতাকে অনেক গুণ বাড়িয়ে দিচ্ছিল।

আকাশে ছন্নছাড়া কিছু মেঘ ভেসে বেড়াচ্ছিল। জলের মিহি দানা মেশানো হাওয়া বয়ে যাচ্ছিল ঝির ঝির করে।

মুখোমুখি বসে এলোমেলো কথা বলতে বলতে হঠাৎ কি যেন হয়ে গিয়েছিল দু'জনের। সেদিনের স্তব্ধ নির্জন দুপুর অনিবার্য নিয়তির মত দুটি যুবক-যুবতীকে পরস্পরের খুব কাছে টেনে নিয়ে এসেছিল, ঘটিয়ে দিয়েছিল আশ্চর্য এক ম্যাজিক।

একসময় দীপা বিচিত্র এক ঘোরের মধ্যে টের পেয়েছিল সে আর অনীশ বিছানায় শুয়ে আছে আর দু'জনের শরীর কি এক অভ্রান্ত নিয়মে গলে গলে মিশে যাচ্ছে। অস্পষ্টভাবে সে অনুভব করতে পারছিল দুটো পুরু উষ্ণ ঠোঁট তার ঠোঁটের সব নির্যাস শুষে নিচ্ছে।

কতক্ষণ পর কে জানে, দুটো শরীর বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল।

তারপরও অপরিসীম সুখানুভূতিতে সমস্ত স্নায়ু আচ্ছন্ন হয়ে ছিল দীপার।

কিন্তু কখন যেন একসময় ঘোর কেটে গিয়েছিল দীপার। চমকে ধড়মড় করে উঠে বসেছে সে। শ্বাসরুদ্ধের মতো শাড়ি-টাড়ি টেনে উরু হাঁটু এবং পায়ের পাতা ঢেকে, দুই হাতে মুখ গুঁজে আচমকা ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠেছিল।

তার পিঠে একটা হাত রেখে নরম গলায় অনীশ বলেছে, 'কাঁদছ কেন?'

দীপার কান্না থামেনি। উদভ্রান্তের মত মাথা নাড়তে নাড়তে সে বলেছে, 'এ কি করলাম আমি, এ কি করলাম!'

আস্তে আস্তে দীপার পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে অনীশ বলেছে, 'এত ভেঙে পড়ছ কেন? যা হল তাতে অস্বাভাবিক কিছু নেই। কোয়াইট ন্যাচারাল।'

ভয়ে ভয়ে দীপা জিজ্ঞেস করেছে, 'যদি কিছু হয়ে যায়?'

'হলে তখন দেখা যাবে। অত নার্ভাস হয়ো না ত। স্মাইল—হাসো হাসো।'

এরপর থেকে গড়িয়াহাটার মোড়ে সন্ধ্যের আগে আগে অনীশের সঙ্গে রোজ দেখা হতে লাগল। দিনগুলো স্বপ্নের মধ্যে যেন উড়ে যাচ্ছিল।

মাস তিনেক বাদে হঠাৎ একদিন স্নান করতে গিয়ে মাথা ঘুরে পড়ে গিয়েছিল দীপা। সেই সঙ্গে হড় হড় করে বমি, সারা শরীর একেবারে মাখামাখি হয়ে গিয়েছিল তার।

কমলা রান্নাঘর থেকে ছুটে এসে দীপার হাত-পা-মুখ-বুক ধুইয়ে, জামাকাপড় বদলে ঘরে এনে শুইয়ে দিয়েছিল।

প্রথমটা কমলার মনে হয়েছিল, খাওয়া-দাওয়ার গোলমালে বদহজম হয়েছে, কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যে তার অভিজ্ঞ চোখ আতিপাতি

করে দীপার চোখে-মুখে কি যেন খুঁজতে শুরু করেছিল। খুবই উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছিল কমলাকে।

মায়ের দিকে তাকাতে পারছিল না দীপা। সে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে রাখতে চেষ্টা করছিল।

বেশ কিছুক্ষণ বাদে মায়ের সমস্ত শরীর যেন হুড়মুড় করে ভেঙে তার পাশে পড়ে গিয়েছিল। তার মুখ থেকে সব রক্ত পড়তে পড়তে নেমে গিয়ে সাদা হয়ে গেছে। দু হাতে দীপাকে জড়িয়ে ধরে কাঁপা শিথিল গলায় সে বলেছিল, 'কে আমাদের এমন ক্ষতি করল ?'

দ্রুত মায়ের দিকে এক পলক তাকিয়েই উপুড় হয়ে বালিশে মুখ গুঁজে দিয়েছিল দীপা। সেই দুপুরের প্রথম মাসটায় সে বুঝতে পারেনি কিন্তু দ্বিতীয় মাস থেকে একটু একটু করে নিজের শরীরে কিসের একটা সংকেত পাচ্ছিল। বিবাহিতা দু-একজন বন্ধুর কাছে এ-সব ব্যাপ্যারে আগেই দীপা অনেক কিছু শুনেছে। নিজের দেহে সেই লক্ষণগুলি আবছাভাবে ফুটে উঠতে দেখছিল সে। আর এখন ত—

শ্বাস টানার মতো শব্দ করে চাপা গলায় কমলা আবার বলেছিল, 'কিরে, চুপ করে আছিস কেন ? বল—'

দীপা মুখ তোলেনি, বালিশে মুখ গুঁজে রেখেই আবছা গলায় অনীশের নাম বলেছিল।

খুব অবাক হয়নি কমলা। এটা যেন এক রকম জানাই ছিল তার। তবু ভয়ার্ত মুখে সে বলেছে, 'কি হবে এখন ? অনীশ কিছু বলেছে ?'

'ভাবতে বারণ করেছে।'

'বিয়ের কথা কিছু বলেছে ?'

'না।'

'শেষে যদি পিছিয়ে যায় ?'

দীপা উত্তর দেয়নি।

কি চিন্তা করে কমলা জিজ্ঞেস করেছিল, 'তোর বাবাকে অনীশদের বাড়ি পাঠাব ?'

দীপা বলেছে, 'আর কিছুদিন যাক না—'

আর দেরি করলে লোকের কাছে মুখ দেখানো যাবে না।

একটু চুপ। তারপর কমলাই ফের বলেছে, 'অনীশ কি এর মধ্যে আমাদের এখানে আসবে?'

দ্বিতীয় বার সেই যে অনীশ দীপার খোঁজে অঘোর নন্দী লেনে এসেছিল, তারপর থেকে মাঝে মাঝেই আসত। দীপা বলেছিল, 'আসতে পারে। আমাকে কিছু বলেনি।'

কমলা বলেছিল, 'দু-চার দিনের ভেতর না এলে তোর বাবাকে পাঠাতেই হবে। এ নিয়ে কারও আপত্তি আমি শুনব না।' চির-দিনের ভীরু কমলাকে সেই মুহূর্তে ভীষণ একরোখা আর জেদী মনে হয়েছিল। সর্বক্ষণ যে ভয়ে কুঁকড়ে থাকে তার ভেতর থেকে অন্য এক কমলা বেরিয়ে এসেছিল যেন।

অনীশ কবে আসবে সে জন্য খুব বেশি অপেক্ষা করতে হয়নি, পরের দিনই সে দীপাদের বাড়ি চলে এসেছিল।

আগের দিন হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ায় সেদিন কসবায় যায়নি দীপা। সন্ধ্যেবেলা তার জন্য গোল পার্কে দাঁড়িয়ে থেকে থেকে শেষ পর্যন্ত কি ভেবে অঘোর নন্দী লেনে চলে এসেছে অনীশ। বাইরের দরজায় কড়া নাড়তে আদিনাথ এসে তাকে ভেতরে নিয়ে গিয়েছিল। অন্যদিন সে এলে আদিনাথ বা কমলা সোজা দীপার ঘরে পাঠিয়ে দেয়। কিন্তু সেদিন আদিনাথ বলেছিল, 'তোমার সঙ্গে খুব জরুরি কথা আছে। এসো—'

অনীশ রীতিমত অবাকই হয়েছিল। চমকে আদিনাথের দিকে তাকিয়েছে সে। আদিনাথের মুখে চাপা অসন্তোষ ক্ষোভ বিরক্তি বা অন্য কি যে ছিল, ঠিক বুঝতে পারেনি। তবে এটা টের পেয়েছে, এই আদিনাথ অন্যদিনের আদিনাথের মতো নয়। যে মানুষ মেয়ের রোজগারে বেঁচে থাকার গ্লানিতে জড়সড় হয়ে থাকে এই আদিনাথের মধ্যে তাঁকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। অনীশ কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করছিল।

আদিনাথ সেদিন তাকে নিয়ে সোজা নিজের ঘরে ঢুকেছিল। একটা হাতল-ভাঙা চেয়ারে অনীশকে বসিয়ে, তার মুখোমুখি বসতে বসতে বলেছিল, 'আজকালের ভেতর তুমি না এলে আমাকে তোমাদের বাড়ি যেতে হত।'

হঠাৎ নার্ভাস হয়ে পড়েছিল অনীশ। বলেছিল, 'কেন বলুন ত?' গলার স্বরটা স্বাভাবিক ছিল না তার, ভীষণ কাঁপছিল।

এদিকে দীপা নিজের ঘরে শুয়ে ছিল। শুয়ে শুয়েই টের পেয়েছিল, অনীশ এসেছে। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পরও যখন অনীশ তার ঘরে এল না তখন আস্তে আস্তে উঠে বাইরে বেরিয়ে এসেছিল। সঙ্গে সঙ্গে পাশের ঘরে আদিনাথ এবং অনীশের গলা শুনতে পেয়েছিল। তাছাড়া চোখে পড়েছিল, ওই ঘরেরই দরজার ঠিক বাইরে শ্বাসরুদ্ধের মতো দাঁড়িয়ে আছে কমলা। নিজের অজান্তেই মায়ের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল সে। ওখান থেকে অনীশ এবং আদিনাথকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল।

আদিনাথ তখন বলছে, 'আমাদের ফ্যামিলিকে লোকলজ্জার হাত থেকে বাঁচাও।'

অনীশ বলেছিল, 'আপনার কথা ঠিক বুঝতে পারছি না।'

'বুনা তোমাকে কিছু বলেনি?'

দীপার ডাক-নাম যে বুনা, এতদিনে জেনে গেছে অনীশ। সে বলেছিল, 'না।'

'লজ্জায় হয়ত বলতে পারেনি। কিন্তু আমার পক্ষে মুখ বুজে থাকা সম্ভব না।' এক নিশ্বাসে কথাগুলো বলে একটু থেমেছিল, আদিনাথ। তারপর আবার শুরু করেছে, 'দীপা অন্তঃসত্ত্বা হয়েছে, তোমার সন্তান তার পেটে।'

মুহূর্তে মুখটা রক্তশূন্য হয়ে গেছে অনীশের। গল গল করে ঘামতে শুরু করেছিল সে। ভাঙা ভাঙা দুর্বল স্বরে বলেছে, 'কি বলছেন আপনি!'

'ঠিকই বলছি।' আদিনাথ সোজাসুজি অনীশের চোখের দিকে তাকিয়েছিল।

অনীশ মুখ নামিয়ে নিয়েছিল, ঘামে তখন তার জামা-টামা ভিজে গেছে। পুরনো বাড়ির সেই ছোট চাপা ঘরটায় তার দম যেন আটকে আসছিল।

আদিনাথ এবার বলেছে, 'দেখ বাবা, মানুষের শরীরে কামের প্রবৃত্তি থাকবে, সাময়িক উত্তেজনায় সে কিছু করে বসবে, এটা অস্বাভাবিক কিছু না। তাছাড়া যুবক-যুবতীকে ত ঘি আর আগুনই বলা হয়। যা হবার তা হয়েই গেছে, এখন তোমাকে বুনা আর তোমার সন্তানের দায়িত্ব নিতে হবে।'

বাবাকে যত দেখছিল ততই অবাক হয়ে যাচ্ছিল দীপা। ভীরু বেকার এবং মেয়ের পয়সায় বেঁচে-থাকা একটা অপদার্থ মানুষের মতো নয়, একজন ব্যক্তিত্বসম্পন্ন দায়িত্বশীল পিতার মতো কথা বলছিল আদিনাথ। ফলে বাবার সম্বন্ধে খুবই শ্রদ্ধা হচ্ছিল। সেই সঙ্গে ভেতরে ভেতরে তীব্র উৎকণ্ঠাও বোধ করছিল। আদিনাথ যেভাবে যা যা বলছে তাতে অনীশ অসন্তুষ্ট না হয়। তার প্রতিক্রিয়া খারাপ হলে দীপাকে যে কি বিপদে পড়তে হবে, সে-ই জানে।

অনীশের মুখ চোখ দেখে মনে হচ্ছিল, সে বুঝিবা একটা অতল খাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে আর যে কোনো মুহূর্তে আদিনাথ তাকে ধাক্কা মেরে নিচে ফেলে দেবে। ভয়ার্ত শুষ্ক গলায় সে বলে-ছিল, 'আমাকে একটু ভাবতে দিন।'

'ভাবাভাবির সময় নেই অনীশ।' আগের দিন যেভাবে কমলা দীপাকে বলেছিল অবিকল সেই সুর এবং সেই ভঙ্গিতে আদিনাথ অনীশকে বলে যাচ্ছিল, 'তুমি ত জানোই, আমরা কত গরিব, তবু মানসম্মান বলে কিছু ত একটা আছে। তুমি যদি দয়া না কর, সেটা ত যাবেই, তার ওপর মেয়েটাকে গলায় দড়ি দিতে হবে।'

তক্ষুণি উত্তর দেয়নি অনীশ। অনেকক্ষণ পর বলেছিল, 'ঠিক আছে, আমি বাড়িতে গিয়ে মা-বাবার সঙ্গে কথা বলি।'

'কবে আমরা জানতে পারব?'

'কাল।'

'তুমি আসবে?'

'হ্যাঁ।'

এরপর আর কোনো কথা হয়নি। মাথা নীচু করে ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছিল অনীশ এবং কমলা আর দীপাকে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিল।

দীপা বলেছিল, 'এসো আমার ঘরে।'

অনীশ আস্তে মাথা নেড়েছে, 'না, আজ থাক।' দীপাদের পাশ দিয়ে সে সদর দরজার দিকে চলে গিয়েছিল।

দীপা তার পিছু পিছু গেছে। বলেছে, 'দু'মিনিট বসে যাও। তোমার সঙ্গে অনেক কথা আছে।'

'আজ আমাকে ক্ষমা কর। প্লীজ—' পেছন ফিরে একবারও দীপার দিকে তাকায়নি অনীশ। অঘোর নন্দী লেনের আঁকাবাঁকা সর্পিল গলি মাড়িয়ে প্রায় টলতে টলতে চলে গিয়েছিল।

পরের দিন অনীশ আসেনি, তার পরের দিনও না। এমন কি দশদিন পার হয়ে যাবার পরও না। এমন কি গোল পার্কে এসে দীপার জন্য অপেক্ষাও করেনি।

উৎকণ্ঠায়, ভয়ে, সামাজিক অসম্মানের আশঙ্কায় দীপাদের গোটা পরিবারটার শ্বাস বন্ধ হয়ে গিয়েছিল যেন। দীপার পেটে ভ্রূণটা যত বড় হচ্ছিল ততই দুশ্চিন্তা এবং উদ্বেগ পাল্লা দিয়ে বেড়ে যাচ্ছিল।

দশদিন পর আদিনাথ বলেছিল, 'ও আর আসবে না, মনে হচ্ছে।'

আদিনাথের কথাগুলো যেন বাতাসে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে দিয়েছিল। দীপা বিমূঢ়ের মতো বাবার দিকে একবার তাকিয়ে মুখ নামিয়ে নিয়েছে।

আদিনাথ দাঁতে দাঁত চেপে বলেছে, 'বিশ্বাসঘাতক! পশু!'

বাবা যা-ই বলুক, অনীশকে এতটা নিচের স্তরে নামাতে ইচ্ছে হয়নি দীপার। সে তখনও ভাবছিল, নিশ্চয়ই অনীশ সুখবর নিয়ে

আসবে। মা-বাবাকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে রাজী করাতে খানিকটা সময় লাগছে। সহজে এরকম একটা ব্যাপার কেউ কি মেনে নেয়!

কমলা পাশেই দাঁড়িয়েছিল। এ ক'দিনে না খেয়ে, না ঘুমিয়ে প্রচণ্ড দুর্ভাবনায় তার শরীর একেবারে ভেঙে গেছে। চোখের কোলে স্থায়ী কালির ছোপ পড়েছে, গাল বসে গেছে, কণ্ঠার হাড় ফুঁড়ে বেরিয়েছে। সে বলেছিল, 'এখন কি হবে মেয়েটার? আমরা যে শেষ হয়ে গেলাম।'

একটু দূরে মূর্তির মতো বসে ছিল পিণ্টু। আগেই সে দীপার ব্যাপারটা জেনেছে। আদিনাথের মতো প্রচণ্ড রাগে পিণ্টু ফেটে পড়েনি বা কমলার মতো ভেঙে চুরমারও হয়ে যায়নি, শুধু বিষণ্ণ চোখে দীপার দিকে তাকিয়ে থেকেছে। পিণ্টুকে এভাবে স্তব্ধ হয়ে বসে থাকতে কখনো কেউ দেখেনি।

এদিকে আদিনাথ স্ত্রীকে বলেছিল, 'তুমি মনে করেছ, আমি ওকে ছেড়ে দেব? কক্ষণো না। এত বড় একটা অন্যায় করে হারামজাদা বজ্জাত পার পেয়ে যাবে, আমি তা হতে দেব না। দেশে আইন-কানুন এখনও আছে।'

অসহায় ভঙ্গিতে কমলা জিজ্ঞেস করেছে, 'কি করতে চাও তুমি? কত বড়লোক ওরা জানো! পয়সার জোরে ওরা আইনকানুন কিনে নিতে পারে।'

'অত সোজা না। এখনই আমি ওদের বাড়ি যাচ্ছি।' বলে জামা-কাপড় বদলাবার জন্য ঘরের দিকে পা বাড়িয়ে দিয়েছিল আদিনাথ।

দীপার সমস্ত অস্তিত্বের মধ্যে হঠাৎ কি একটা প্রতিক্রিয়া ঘটে গিয়েছিল যেন। আদিনাথকে থামিয়ে সে বলেছিল, 'তোমাকে যেতে হবে না বাবা—'

বিমূঢ়ের মতো আদিনাথ জিজ্ঞেস করেছে, 'তাহলে?'

'আমি নিজেই যাব।'

'তুই!'

'হ্যাঁ বাবা—' আস্তে মাথা নেড়েছে দীপা, 'যা করবার আমিই করব।

'কিন্তু তুই ছেলেমানুষ। ওদের সঙ্গে কি পারবি!'

'দেখি একবার।' দীপার মুখ শক্ত হয়ে উঠেছিল।

তারপর আজ কিছুক্ষণ আগে হরপ্রসাদ সরণিতে মণিমোহন চ্যাটার্জী আর অনীশের সঙ্গে দেখা করে এসেছে। অনীশ পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছে, সে তাকে চেনে না। চরম অপমান করে ওরা তাকে বাড়ি থেকে বার করে দিয়েছে।

একটা ব্যাপার কিছুতেই দীপা বুঝে উঠতে পারছে না, তার মতো গরিব পরিবারের মেয়ের সঙ্গে এত ঘনিষ্ঠভাবে কেন মিশেছিল অনীশ? প্রথম দিকে তার কথায়বার্তায় বা আচরণে ত এতটুকু গোলমাল ছিল না। কিন্তু দীপা গর্ভবতী হবার পর সে পালাল কেন? মণিমোহন চ্যাটার্জীর ভয়ে? বাবার কাছে অনীশ যে কুঁকড়ে থাকে সেটা নিজের চোখেই দেখে এসেছে দীপা। বাবার ভয়ে তাকে পিছিয়ে যেতেই হবে, এটা জানা সত্ত্বেও সে কেন তার এমন মারাত্মক ক্ষতিটা করল?

একটা মেরুদণ্ডহীন কেঁচোর বীজ পেটে নিয়ে কার জন্ম দিতে চলেছে দীপা? ঘৃণায় অপমানে তার সমস্ত শরীর ঘিন ঘিন করতে লাগল। মনে হল, বমি করে ফেলবে। সেই সঙ্গে অসহ্য এক রাগ তার মাথায় অগ্নিকাণ্ড ঘটিয়ে দিতে লাগল।

কতক্ষণ চুপচাপ বাইরের পাঁচিলের দিকে তাকিয়ে বিছানায় পড়ে ছিল, দীপার খেয়াল নেই। হঠাৎ বাইরের বারান্দা থেকে পিন্টুর চিৎকার ভেসে এল, 'শুয়ারের বাচ্চার বডি আমি ফেলে দেব। শ্লা বেজন্মা, এক্ষুণি যাচ্ছি। দেখব কে তোকে বাঁচায়—'

সঙ্গে সঙ্গে আদিনাথ এবং কমলা একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল, 'মাথা গরম করিস না পিন্টু। তুই ঠাণ্ডা হয়ে বস। যা করার আমরা করব।'

দীপা আর শুয়ে থাকতে পারল না। দ্রুত বিছানা থেকে নেমে দৌড়ে বারান্দায় চলে এল। অবরুদ্ধ গলায় বলল, 'কি হয়েছে?'

আদিনাথ বলল, 'পিণ্টু অনীশদের বাড়ি যেতে চাইছে।'

উত্তেজিত হৈ-চৈ শুনে এরকমই কিছু ভেবেছিল দীপা। বলল, 'ওখানে গিয়ে কি হবে?'

পিণ্টু বলল, 'না গেলে হারামীর বাচ্চাকে টাইট দেব কি করে? শ্লা, ঢালীপাড়া বস্তি ঝেঁটিয়ে সব লোক নিয়ে ওদের বাড়ি ঘেরাও করব। দশটা পেটো ঝাড়লে বাপ বাপ বলে মাকড়া লাইনে এসে যাবে।'

দীপা চমকে উঠল, 'তুই কি চাস আমি আত্মহত্যা করি—'

'মানে?'

'বস্তির লোকেরা যখন জিজ্ঞেস করবে, হঠাৎ মণিমোহন চ্যাটার্জীর বাড়ি কেন ঘেরাও করতে যাচ্ছিস, তখন তাদের কী বলবি?'

পিণ্টু থতিয়ে গেল। মুখ নিচু করে বলল, 'কিন্তু একদিন না একদিন সবাই তো ওই শালার কথা জানবে।'

পিণ্টুর সঙ্গে এ ব্যাপারে কথা বলতে লজ্জায় সঙ্কোচে মাথা কাটা যাচ্ছিল দীপার। কিন্তু না বলেই বা উপায় কি! হঠকারিতা বা উত্তেজনার ঝোঁকে লোকজন জুটিয়ে সে যদি সত্যি সত্যিই অনীশদের বাড়ি বোমা মারতে যায়, ভয়ানক বিপদে পড়ে যাবে। মণিমোহন পুলিস দিয়ে ওকে ধরিয়ে পাঁচ সাত বছরের জন্য জেলে ঢুকিয়ে দিতে পারেন। যাদের অত টাকা তারা প্রফেসনাল মার্ডারার লাগিয়ে পিণ্টুকে খুনও করাতে পারে।

তা ছাড়া অন্য দিক থেকে মারাত্মক অস্বস্তির কারণও আছে। পিণ্টুটার যেরকম মাথা গরম, রাগের মাথায় বস্তির লোকেদের নিশ্চয়ই গিয়ে বলবে, অনীশ দীপাকে গর্ভবতী করে পালিয়ে গেছে। এটা জানাজানি হলে এখানে আর থাকা যাবে না। হয় আত্মহত্যা, নইলে রাতের অন্ধকারে মুখ ঢেকে চোরের মতো চলে যেতে হবে।

হঠাৎ দীপার চোখে পড়ল, বাড়ির অন্য ভাড়াটেরা বাবা আর

পিণ্টুর চেঁচামেচিতে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে হাঁ করে তাদের কথা শুনছে। তাড়াতাড়ি ভাইকে নিজের ঘরে টেনে এনে বোঝাতে লাগল দীপা। তার ব্যাপার নিয়ে কোনরকম হৈ-চৈ যেন বাধিয়ে না বসে পিণ্টু। মাথা ঠাণ্ডা করে ভেবে চিন্তে মণিমোহনদের মতো প্রবল প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে এগুতে হবে, নইলে ওরা একেবারে শেষ করে দেবে।

দীপার কথাটা পছন্দ হল না পিণ্টুর। দুর্বিনীত ঘাড় বাঁকিয়ে বলল, 'শ্লা, তোর এত বড় ড্যামেজ করে হড়কে বেরিয়ে যাবে আর আমরা ভেবে চিন্তে এগুব! আমার ত পেটো ঝেড়ে ঝেড়ে হোল ওয়ার্ল্ড একেবারে পাউডার করে দিতে ইচ্ছে করছে। তুই আমাকে আটকাস না দিদি।'

'কিন্তু—'

'তুই ভাবছিস ওরা টাকার জোরে আমাকে শেষ করে দেবে, এই ত? এতদিন তুই আমাকে খাইয়ে পরিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছিস। তোর প্রেসটিজের জন্যে লাইফটা যদি চলে যায়—যাবে।'

দু'চোখ জলে ভরে গিয়েছিল দীপার। গভীর আবেগে পিণ্টুর একটা হাত নিজের মুঠিতে তুলে নিয়ে সে বলল, 'আমার একটা কথা তোকে শুনতেই হবে।'

'কি?'

'ক'টা দিন আমাকে সময় দে। এর ভেতর যদি ভেবে বার করতে না পারি তোর যা ইচ্ছে করিস।'

চোখ কুঁচকে কি চিন্তা করল পিণ্টু। তারপর বলল, 'ঠিক আছে, তোকে এক উইক টাইম দিলাম।' বলেই বেরিয়ে গেল।

আর ধীরে ধীরে ফের বিছানায় গিয়ে শুয়ে দুহাতে মুখ ঢাকল দীপা। মণিমোহনদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসার সময় যা ভেবেছিল, আরও একবার সেই কথাই তার মনে পড়ে গেল। মণিমোহন চ্যাটার্জীদের বিরুদ্ধে তার মত দুর্বল অসহায় সম্বলহীন একটি মেয়ে যুদ্ধ চালাবে কিভাবে?

চার

অনীশদের বাড়ি থেকে ফেরার পর দুটো দিন কেটে গেছে। এর মধ্যে যান্ত্রিক নিয়মে দৈনন্দিন কাজগুলো করে গেছে দীপা। ডেইলি রুটিনে এতটুকু হেরফের হয়নি। সকালে উঠে স্কুলে যাওয়া, দুপুরে বাড়ি ফিরে খেয়েদেয়ে সামান্য রেস্ট নিয়েই কসবায় টিউশানি—এই ভাবেই কেটে গেল।

এই দু'দিনে পেটের ভ্রূণ নিশ্চয়ই আরও একটু বড় হয়েছে কিন্তু অনীশদের বিরুদ্ধে কোনো রণকৌশল এখনও ঠিক করে উঠতে পারেনি দীপা। একবার ভেবেছে, অনীশদের বাড়ি যাবে। পরক্ষণেই এই চিন্তাটা খারিজ করে দিয়েছে। ওখানে গিয়ে কাজের কাজ কিছু হবে না। প্রথমতঃ দারোয়ান তাকে চিনে রেখেছে, কিছুতেই বাড়ির ভেতর ঢুকতে দেবে না। জোরজার করে ঢুকলেও পুলিস ডেকে মণিমোহন তাদের হাতে তাকে তুলেও দিতে পারেন। চুরি, অনধিকার প্রবেশ বা ব্ল্যাকমেলিং—পয়সার জোরে এরকম ডজন ডজন চার্জে ফাঁসিয়ে দিলে দীপা কি করতে পারে?

দীপা আরও ভেবেছে, বাড়িতে না ঢুকে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকবে। অনীশ যখন ভেতরে ঢুকবে বা বেরুবে তখন তাকে ধরবে। কিন্তু তৎক্ষণাৎ মনে হয়েছে, যে মুখের ওপর বলে দিয়েছে তাকে চেনে না—এমন একটা নোংরা কৃমিকে ধরে কি লাভ? যদি তার সঙ্গে দেখাও হয়ে যায়, কি করবে দীপা? চিৎকার করে রাস্তায় লোক জড়ো করবে? গালাগাল দিয়ে, অপমান করে তাকে ধুলোয় মিশিয়ে দেবে? কিন্তু এ সব তার পক্ষে আদৌ সম্ভব নয়।

আরেকটা কাজও করা যায়। হরপ্রসাদ সরণির প্রতিটি বাড়িতে গিয়ে জানিয়ে দেওয়া যায়, অনীশ তার কি পরিমাণ ক্ষতি করেছে। কিন্তু এ সব করতে হলে নিজের গর্ভবতী হবার প্রসঙ্গটা অনিবার্য

নিয়মেই উঠবে। এটা তো মিথ্যে নয়, সেদিন নিঝুম দুপুরে নির্জন বাড়িতে যা ঘটেছিল তাতে দীপারও তো সায় ছিল। তার অনিচ্ছা বা আপত্তি থাকলে এই দেহ কোনোভাবেই দখল করতে পারত না অনীশ। কাজেই তৃতীয় এই চিন্তাটাকে নাকচ করে দিতে হয়েছে।

দু'দিন পর আজ কসবা থেকে ফিরে নিজের ঘরে বসে ছিল দীপা। তার চোখ জানালার দিকে ফেরানো। এখন পরিপূর্ণ পূর্ণিমা চলছে। রুপোর থালার মতো গোল চাঁদ উঠেছে আকাশে। দুধের মতো অঢেল জ্যোৎস্নায় বস্তি এবং আবর্জনায়-ভরা কলকাতা আশ্চর্য মায়াবী হয়ে আছে। দীপা সে সব কিছুই দেখছিল না, অন্যমনস্কের মতো শুধু তাকিয়েই, আছে।

এখনও অবশ্য খুব খুঁটিয়ে না দেখলে বাইরে থেকে গর্ভধারণের লক্ষণ বোঝা যায় না কিন্তু ক'দিন আর ? খুব বেশি হলে মাসখানেক বা মাস দুয়েক। যা করার তার মধ্যেই করে ফেলতে হবে। বাইরে থেকে আদিনাথের গলা ভেসে এল, 'বুনা—'

জানালার দিক থেকে আস্তে আস্তে এধারে মুখ ফিরিয়ে দীপা দেখতে পেল, একা বাবাই না, মা-ও দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। সে জিজ্ঞেস করল, 'কিছু বলবে ?'

'হ্যাঁ।' দু'জনে ঘরে ঢুকল। আদিনাথ বসল চেয়ারে, আর কমলা তক্তাপোষে দীপার গা ঘেঁষে।

কারো সঙ্গ এই মুহূর্তে ভাল লাগছিল না দীপার, সে কিছুটা নিস্পৃহ চোখে আদিনাথের দিকে তাকিয়ে রইল।

আদিনাথ বলল, 'একটা কথা ভেবে দেখলাম বুনা—'

'কি ?'

'অনীশদের নামে কেস করা দরকার। আজ দুপুরে জানাশোনা একজন উকিলের কাছে গিয়েছিলাম। সে বললে, কেস করলে আমরা জিতে যাব।' প্রবল উৎসাহে আদিনাথ বলতে লাগল, 'কান

ধরে ওকে বিয়ে ত করানো যাবেই, ক্ষতিপূরণও আদায় করতে পারব। তুই কি বলিস?'

দীপা জিজ্ঞেস করল, 'কেস যে করবে, টাকা পাবে কোথায়? তোমার উকিল কি বিনে পয়সায় আমাদের জন্যে মামলা লড়বে?'

আদিনাথের উৎসাহ অনেকখানি নিভে গেল। টাকা পয়সায় কথাটা আগে ভেবে দেখেনি। সে বলল, 'তুই কিছু টাকা যোগাড় করতে পারবি না?'

রেগে উঠতে গিয়েও হঠাৎ হেসে ফেলল দীপা। বলল, 'কিভাবে সংসার চলছে, জানো না? প্রতি মাসেই কিছু না কিছু ধার হয়ে যাচ্ছে। কেস করার টাকা আমাকে কে দেবে? আর দিলেও শোধ করব কি করে?'

এই সময় ভয়ে ভয়ে কমলা বলে উঠল, 'সেই হারটা বেচে দিয়ে বরং—'

এই হারের একটা ছোট্ট ইতিহাস আছে। আদিনাথের চাকরি চলে যাবার পর তার কোম্পানি থেকে কিছু টাকা পাওয়া গিয়েছিল। সেই টাকা থেকে দীপার বিয়ের জন্য একটা হার, এক জোড়া কানের দুল আর চারগাছা ব্রোঞ্জের ওপর সোনার পাত বসানো চুড়ি বানিয়ে রাখা হয়েছিল। হাজার কষ্ট এবং অভাব সত্ত্বেও ওই সোনার জিনিস ক'টা বিক্রির কথা আদিনাথরা ভাবতেও পারেনি। মানসিক দিক থেকে কতটা মরিয়া হয়ে উঠলে শেষ সম্বলটুকু বেচার সিদ্ধান্ত নেওয়া যেতে পারে, দীপা বুঝতে পারছিল। এ সবই তার সম্মান এবং সুরক্ষিত ভবিষ্যতের জন্য। মা-বাবা যে তার জন্য এতটা ভেবেছে, এই কারণে কৃতজ্ঞতা এবং গভীর আবেগে দীপার মন ভরে গেল। তবু অন্য একটা দিক সে ভোলেনি, সেটা কঠিন নিষ্ঠুর বাস্তবের দিক। দীপা বলল, কিন্তু মা, ওই গয়না ক'টা বেচে তুমি কত টাকা পাবে?'

কমলা জিজ্ঞাসু চোখে আদিনাথের দিকে তাকাল। সোনার দাম সম্বন্ধে তার পরিষ্কার ধারণা নেই। আদিনাথ বলল, 'তিন-চার হাজারের মতো পেতে পারি।'

দীপা কি বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই পাশের ঘরের শিবানী দরজা দিয়ে মুখ বাড়াল। আদিনাথকে বলল, 'দাদা, আপনাকে কে ডাকছে।'

'কে ?' আদিনাথ চেয়ার থেকে উঠতে উঠতে জিজ্ঞেস করল।

'নাম বলেনি।' শিবানী আর দাঁড়াল না। আদিনাথ ঘর থেকে বেরিয়ে উঠোন পেরিয়ে সোজা সদরের দিকে চলে গেল।

এমনিতে আদিনাথের কাছে লোকজন বড় একটা কেউ আসে না। এই অঘোর নন্দী লেনে বেশ কয়েক বছর কাটালেও তার চেনাজানা মানুষের সংখ্যা খুবই কম। একসময় বন্ধুবান্ধব নিয়ে হৈ-চৈ করে জীবন কাটিয়ে দিতে ভালবাসত সে, তখন দিনরাত তাকে ঘিরে কত মানুষ, কত বন্ধু! কিন্তু চাকরি যাবার পর যেদিন ঢালী-পাড়া বস্তির গায়ে এই গলিতে চলে এল সেদিন থেকেই নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছে আদিনাথ। বাজার করার সময়টুকু ছাড়া পারতপক্ষে সে বাড়ি থেকে বেয়োয় না। বারান্দার এক কোণে একটা ভাঙা চেয়ারে সারাক্ষণ যে নিজেকে আটকে রেখেছে তার সঙ্গে কারো আলাপ পরিচয় বা ঘনিষ্ঠতা হওয়া সম্ভব না, কাজেই কেউ তার কাছে আসেও না। আচমকা আজ একজন এসে পড়ায় সবাই বেশ অবাকই হল।

দীপা এবং কমলা খোলা দরজা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে ছিল। একটু পর তারা দেখতে পেল, দামী ধুতি-পাঞ্জাবি পাম্প শু্য পরা মধ্য-বয়সী একটি লোককে সঙ্গে করে উঠোন পেরিয়ে পাশের ঘরে নিয়ে গেল আদিনাথ। লোকটাকে আগে আর কখনও দেখেছে বলে দীপা মনে করতে পারল না। তবে তার মনে কোথায় যেন একটা খটকা লাগছে। হুট করে বাবা কেন একটা অচেনা লোককে একেবারে নিজেদের শোওয়ার ঘরে নিয়ে তুলল ? দীপা কমলাকে জিজ্ঞেস করল, 'এই লোকটাকে চেন ?'

'না।' কমলা মাথা নাড়ল, 'আগে আর কোনোদিন এ বাড়িতে আসেনি।'

কমলার কথা শেষ হতে না হতেই আদিনাথ আবার এ ঘরে

এল। তাকে রীতিমত উত্তেজিত দেখাচ্ছে। চাপা গলায় বলল, 'মণিমোহন চ্যাটার্জী দূত পাঠিয়েছে।'

স্নায়ুগুলো মুহূর্তে টান টান হয়ে উঠল দীপার। শিরদাঁড়া আপনা থেকেই সোজা হয়ে গেল।

এদিকে কমলাও চকিত হয়ে উঠেছে। ভীরু গলায় জিজ্ঞেস করল, 'কেন, হঠাৎ লোক পাঠাল?'

'এখনও কিছু বলেনি। যা বলার তোমার আমার দু'জনের সামনে বলতে চায়। দু কাপ চা করে ওঘরে এসো।' বলেই চলে গেল আদিনাথ।

কমলাও আর বসে থাকল না। 'দেখি, অনীশের বাবা কি খবর পাঠিয়েছে—বলতে বলতে সে-ও বেরিয়ে গেল।

দীপা লক্ষ্য করেছে, মায়ের চোখে-মুখে গভীর উৎকণ্ঠার সঙ্গে একটু আশাও চিকচিকিয়ে উঠেছে। মা হয়ত ভেবেছে, মণিমোহন চ্যাটার্জী তাঁর মত পাল্টেও থাকতে পারেন। দীপাকে বাড়ি থেকে বের করে দেবার পর তাঁর অনুশোচনা হয়ে থাকতে পারে। সেই কারণে একটা মিটমাট করে নিতে চাইলেন।

মায়ের মতো দীপা অবশ্য আশাবাদী নয়। তবু কি কারণে মণিমোহন হঠাৎ লোক পাঠিয়ে বসলেন তা জানার জন্য তীব্র কৌতূহল বোধ করতে লাগল। কতক্ষণ পর খেয়াল নেই, সে উঠে পড়ল। তারপর পা টিপে টিপে বাইরে বেরিয়ে মা-বাবার ঘরের পাশে দরজার আড়ালে গিয়ে দাঁড়াল। যদিও এভাবে চোরের মতো অন্যের কথা শুনতে তার খারাপ লাগে, এটা খুবই কুরুচির ব্যাপার, তবু অপ্রতিরোধ্য কোন শক্তি তাকে নিজের ঘর থেকে যেন এখানে টেনে নিয়ে এসেছে।

দরজাটা আধাআধি ভেজানো। তার ফাঁক দিয়ে দীপা দেখতে পেল, সেই মাঝবয়সী লোকটা মা-বাবার বিছানায় বসে চা খেতে খেতে বলছে, 'এটাকে আপনারা একটা অ্যাকসিডেন্ট বলে ধরে নিন। আজকালকার দিনে ছেলেমেয়েরা কত ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করছে

বলুন ত। আমাদের সময়ে কি এসব ছিল? বেশি মিশলে অনেক সময় এরকম অ্যাকসিডেণ্ট ঘটেই যায়।' বলতে বলতে একটু থেমে সে আবার শুরু করে, 'আপনার মেয়ে একটা ভুল করে বসেছে। এটা অবশ্য কোয়াইট ন্যাচারাল। ওর যা বয়েস তাতে এমন ভুল হতেই পারে। যৌবন বড় গোলমেলে জিনিস মশাই।' লোকটার চোখ মুখ শেষ দিকে দার্শনিকের মতো হয়ে উঠল।

এদিকে শুনতে শুনতে চোয়াল শক্ত হয়ে উঠেছে আদিনাথের। সে কর্কশ গলায় বলল, 'এসব ধানাইপানাই শোনাবার জন্যে মণিমোহন চ্যাটার্জী আপনাকে পাঠিয়েছে নাকি?'

'উঁহু উঁহু—' শশব্যস্তে জিভ কেটে লোকটা বলেছে, 'শুধু এসব কেন, আরও অনেক দরকারী কথা আছে আপনার সঙ্গে।'

'অনেক কথার দরকার নেই। একটা কথা জানতে পারলেই আমার চলবে।'

'কি বলুন ত।'

'এই যে আমার মেয়েটার এতবড় সর্বনাশ করা হল, তার সম্মান এরপর কি করে বাঁচবে? লোকে যে আর ক'দিন পর আমাদের মুখে চুনকালি মাখিয়ে গায়ে থুতু দিতে দিতে পাড়া ছাড়া করে দেবে।'

'আহা—' ডান হাতে অভয়মুদ্রা ফুটিয়ে লোকটা বলল, 'আপনাদের সবার সম্মান মানে প্রেস্টিজ যাতে বাঁচে, সেই জন্যেই ত চ্যাটার্জী সাহেব একটা ফরমুলা দিয়ে আপনার কাছে আমাকে পাঠিয়েছেন।'

'কিসের ফরমুলা?'

'ভেরি সিম্পল। লোকলজ্জার হাত থেকে আপনার মেয়েও বেঁচে যাবে, আপনারাও মাথা উঁচু করে চলতে পারবেন।'

বিরক্ত গলায় আদিনাথ বলল, 'পরিষ্কার করে বলুন, কিভাবে সেটা সম্ভব।'

লোকটা বেশ নীচু গলায় কথা বলছিল। আচমকা স্বরটাকে আরও কয়েক পর্দা নামিয়ে বলল, 'যদি রাজী থাকেন, কালই একটা

নার্সিং হোম ঠিক করে দিচ্ছি। কয়েক ঘণ্টার মোটে ব্যাপার। সকালে আপনার মেয়েকে ভর্তি করে দিলে সন্ধ্যেবেলা আগের মতো কুমারীটি হয়েই বাড়ি ফিরে আসবে। একেবারে নিষ্পাপ ভারজিন। কারও বাপের সাধ্যি নেই, কিছু টের পায়।'

জানাজানি হবার ভয়ে জোরে চেঁচাতে পারছিল না আদিনাথ। হিংস্র গলায় বলল, 'গর্ভপাত করিয়ে আমার মেয়ের সর্বনাশ করতে চাইছেন?'

'সর্বনাশ কোথায়?' লোকটা কোনো কারণেই উত্তেজিত বা ক্ষিপ্ত হয় না। সব সময় পরম সহিষ্ণু এবং অবিচলিত। নির্বিকার ভঙ্গিতে সে বলতে লাগল, 'অ্যাবরসান করিয়ে তাকে ত নরম্যাল করে দেওয়া হবে। ভাল ছেলে দেখে সম্বন্ধ করে তখন তার বিয়ে দিতে পারবেন। গায়ে এই অ্যাকসিডেণ্টের—'

তার কথা শেষ হবার আগেই প্রায় চেঁচিয়ে উঠল আদিনাথ, 'কি পাগলের মতো প্রলাপ বকছেন মশাই! আমার মেয়ের এমন মারাত্মক সর্বনাশ করে দিল অনীশ। এখন বলছেন গর্ভপাত করিয়ে অন্য ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিতে—' আদিনাথকে উন্মত্তের মতো দেখাচ্ছে। প্রবল রক্তচাপে তার গলা দড়ির মতো পাকিয়ে উঠেছে। চোখ দুটো যেন এই মুহূর্তে ফেটে যাবে।

'দাঁড়ান দাঁড়ান মশাই—' হাত তুলে লোকটা বলল, 'অনীশের কথা কি যেন বললেন? সে কার ক্ষতি করেছে?'

'কার আবার, আমার মেয়ের। ভেবেছেন, অ্যাবরসানের ব্যবস্থা করে সে পার পেয়ে যাবে?'

এ ত অদ্ভুত কথা শুনছি! আপনার মেয়ে সেদিন চ্যাটার্জী সাহেবের সঙ্গে দেখা করে তার অবস্থার কথা বলেছিল। চ্যাটার্জী সাহেবের মনটা ভীষণ নরম, খুবই সিমপ্যাথেটিক টাইপের মানুষ, পরের দুঃখে গলে যান। তাই আমাকে বললেন, মেয়েটাকে লজ্জার হাত থেকে বাঁচিয়ে দাও। আর আপনি কিনা এরকম একটা বাজে ব্যাপারে তাঁর ছেলে অনীশকে জড়িয়ে দিতে চাইছেন? এটা কিন্তু

আপনার কাছে আশা করিনি আদিনাথবাবু—' অত্যন্ত দুঃখিত ভাবে মাথা নাড়তে লাগল লোকটা।

আদিনাথ প্রথমটা থ হয়ে গেল। পরক্ষণেই হিতাহিত জ্ঞানশূন্যের মতো চিৎকার করে উঠল, 'অনীশ এ ব্যাপারে না থাকলে মণিমোহন চ্যাটার্জী এমনি এমনি আমার ছ'কোণা মুখ দেখার জন্যে আপনাকে পাঠিয়েছে?'

লোকটা বলল, 'ওই যে বললাম, অত বড় লোক হলে কি হবে, চ্যাটার্জী সাহেবের হার্টটা একেবারে ফুলের মতো। সামান্য একটা ভুলের জন্যে আপনার মেয়ের জীবনটা নষ্ট হয়ে যাবে, তাই উনি আমাকে পাঠালেন। আপনি ওঁর গ্রেটনেসের কথাটা একবার ভেবে দেখুন।'

শরীরের সব রক্ত হঠাৎ মাথায় উঠে এল আদিনাথের। দাঁতে দাঁত ঘষে সে বলল, 'গ্রেটনেস! আপনার চ্যাটার্জী সাহেবকে বলে দেবেন, তার ছেলেকে আমি পাঁচ বছর জেলের ভাত খাইয়ে আনব। উকিলের সঙ্গে আমি পরামর্শ করেছি এ ব্যাপারে।'

লোকটা আগের মতোই নির্বিকার। ধীরে-সুস্থে পকেট থেকে দুটো কৌটো বার করল সে। এক নম্বর কৌটোটা খুলে বাঁ হাতের তালুতে খানিকটা পানের মসলা ঢালল, তারপর দু নম্বর কৌটো থেকে কয়েক কুচি জর্দা নিয়ে তার সঙ্গে মিশিয়ে মুখে পুরল। জিভের তলায় সেগুলো রেখে আধবোজা চোখে তার ঝাঁঝটা শুষে নিতে নিতে বলল, 'আপনার বয়েস কত আদিনাথবাবু?'

আচমকা এরকম বেখাপ্পা প্রশ্নে হকচকিয়ে গেল আদিনাথ। বলল, 'আমার বয়েস দিয়ে কি হবে?'

'দরকার আছে। বলুন না—'

'ছাপান্ন সাতান্ন।'

'আমারই বয়সী। আমাকে বন্ধু হিসেবে ধরতে পারেন।' লোকটা বলতে লাগল, 'আপনাকে একটা সৎ পরামর্শ দিচ্ছি। একেবারে মাথা গরম করবেন না। আপনি বিশ টাকা ফী'র উকিল

দেবেন, চ্যাটার্জী সাহেব তার বিরুদ্ধে পাঁচ হাজার টাকা ফী'র পাঁচটা ঝানু ব্যারিস্টার দাঁড় করাবেন। একটার জায়গায় পঞ্চাশটা ডেট নেবেন। কতদিন ওঁর সঙ্গে লড়াই চালাতে পারবেন? পরে হয়ত মানহানির কেস করে আপনাদেরই জেলে পাঠাবার ব্যবস্থা করবেন।'

এদিকটা ভেবে দেখেনি আদিনাথ। ভেতরে ভেতরে সে বেশ ঘাবড়েই গেল। দীপার জন্য যে সামান্য সোনাটুকু আছে তা বেচে মণিমোহনের সঙ্গে কতক্ষণ আর যুদ্ধ করা যায়? ভেতরে তার যা-ই চলুক, বাইরে তা ফুটে উঠতে দিল না আদিনাথ। কর্কশ গলায় বলল, 'অন্যায়ও করবে, উল্টে মিথ্যে মামলায় ফাঁসিয়ে জেলেও পাঠাতে চেষ্টা করবে। কারবারটা ভালই। তা মশাই আমাকে ভয় দেখিয়ে কাজ হবে না। যা হবার হবে, জেলে যেতে হয় যাব। কিন্তু অনীশ যে এমনি এমনি পার পেয়ে যাবে, সেটা কিছুতেই হতে দেব না।'

লোকটা বলল, 'আপনি যখন এত জোর দিয়ে বলছেন তখন না হয় ধরেই নিচ্ছি, আপনার মেয়ের অনেক পুরুষ-বন্ধুর মধ্যে অনীশ একজন ছিল—'

তাকে মাঝখানে থামিয়ে দিয়ে আদিনাথ খেঁকিয়ে উঠল, আমার মেয়েকে আপনি ভেবেছেন কি? বাজে বদ ছুকরিদের মত গণ্ডা গণ্ডা ছেলে নিয়ে ঘোরে?'

'আচ্ছা আচ্ছা, তর্কের খাতিরে ধরে নিলাম, তার একজনই পুরুষ বন্ধু ছিল এবং কোনো এক দুর্বল মুহূর্তে দু'জনেই ভুল করে বসেছে। কিন্তু মণ্ডলমশাই, আপনি যদি মনে করেন চ্যাটার্জী সাহেব আপনার মেয়েকে ছেলের বৌ করে ঘরে নিয়ে যাবেন, বিরাট ভুল করবেন। আপনাকে অপমান করছি না। চ্যাটার্জী সাহেবের বেয়াই হিসেবে আপনাকে ভাবতে—মানে বুঝলেন কিনা, হেঁ হেঁ—' একটু থেমে ফের বলল, 'ওই সব আকাশ-কুসুম ভেবে ত লাভ হয় না, মাটিতে পা রেখে বাস্তব ব্যাপারটা বুঝতে হয়। তাই আপনাদের

সম্মানও যাতে বাঁচে আর চ্যাটার্জী সাহেবদের সম্মানও বজায় থাকে, ওই নার্সিং হোমের ফর্মুলাটা দিয়েছিলাম।'

আদিনাথ রক্তাক্ত চোখে লোকটার দিকে তাকিয়ে ছিল। বলল, 'তাহলে মেনে নিচ্ছেন, আমার মেয়ের এই অবস্থার জন্যে অনীশই দায়ী।'

'মেনে নিলাম কোথায়? আপনাদের মনে একটা সন্দেহ যখন দেখা দিয়েছে, চারদিকে একটা ঢিটিক্কার পড়ে যেতে পারে। এ সব স্ক্যাণ্ডাল চ্যাটার্জী সাহেব একেবারেই পছন্দ করেন না। তাই আর কি—' বলতে বলতে গলাটা ঝপ করে অনেকখানি নামিয়ে দিল, 'আমার কথা ভালোয় ভালোয় মেনে নিলে আপনার মশাই লাভই হবে। নার্সিং হোমের খরচা ত দিতেই হবে না। নগদ হাজার দশেক টাকাও পেয়ে যাবেন।'

'অ্যাঁ—'

'ঠিক আছে ঠিক আছে, ওটা পনেরো হাজারই দেওয়া যাবে।'

আদিনাথ বলল, 'টাকা দিয়ে আমাকে—'

তাকে থামিয়ে দিয়ে লোকটা বলল, 'কত দিলে আপনি একেবারে সুবোধ বালক হয়ে যাবেন? কত? আমার দিক থেকে তিরিশ হাজার পর্যন্ত অফার রইল। দু'দিন পর আবার আসব। এর মধ্যে ভেবে-চিন্তে মনস্থির করে রাখবেন। আচ্ছা এখন যাই।' বলতে বলতে উঠে পড়ল সে, 'মনে রাখবেন ভুজঙ্গ ঘোষ যা বলে গেল তাতে আপনাদের ভালই হবে।'

দীপা রুদ্ধশ্বাসে সব শুনে যাচ্ছিল। আর দাঁড়াল না সে, দ্রুত নিজের ঘরে চলে এল। আর সেখান থেকেই দেখতে পেল আদিনাথ লোকটার সঙ্গে চাপা গলায় কি সব বলতে বলতে বাইরের রাস্তায় বেরিয়ে গেল। ওদের কথার একটি বর্ণও আর শুনতে পেল না দীপা।

তিরিশ হাজার টাকার অফারটা তাদের সংসারের ভিত কাঁপিয়ে

দিয়েছে, কয়েক ঘণ্টার মধ্যে সেটা টের পেতে দীপার আদৌ অসুবিধে হল না।

কাল রাত্তিরে মণিমোহন সেই লোকটিকে পাঠিয়েছিলেন। সে চলে যাবার পর থেকেই আদিনাথ আর কমলা অনবরত গুজ গুজ করে কি সব পরামর্শ করে যাচ্ছে। খুব সম্ভব কাল রাত্তিরেও ওরা ঘুমোয় নি। তিরিশ হাজার টাকা সামান্য ব্যাপার না।

আজ সন্ধ্যেবেলায় টিউশানি থেকে ফিরে নিজের ঘরে বসে দীপা চা খাচ্ছে, বাইরে থেকে কমলার গলা কানে এল, 'বুনা—'

এধারে মুখ ফেরাতেই দীপা দেখতে পেল মা দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে। চোখাচোখি হতেই কমলা বলল, 'তোর সঙ্গে একটা কথা আছে।' বলতে বলতে ভেতরে এসে দরজাটা ভেজিয়ে তার গা ঘেঁষে বসল!

মাকে লক্ষ্য করছিল দীপা। চায়ের কাপটা সামনের টেবিলে নামিয়ে রাখতে রাখতে বলল, কি কথা?

কমলা তক্ষুণি উত্তর দিল না। অনেকক্ষণ পর অত্যন্ত কুন্ঠিত ভাবে বলল, 'দেখ মা, যা ক্ষতি হবার তা ত হয়েই গেছে। তবে লোক জানাজানি হবার আগে পেটের আপদটাকে দূর করে দেওয়াই ভাল। নার্সিং হোমে গেলে নাকি একদিনের ভেতর সব ব্যবস্থা হয়ে যায়।'

মায়ের চোখের দিকে তাকিয়ে দীপা বলল, 'কাল দুপুরেও ত বাবা বলছিল অনীশ আমাকে বিয়ে না করলে ওদের নামে কেস করবে, ওদের দিয়ে জেলের ঘানি ঘুরিয়ে ছাড়বে। আজ হঠাৎ সব পাপ ধুয়ে মুছে আমাকে শুদ্ধ করে নিতে চাইছে যে?'

এরকম একটা অস্বস্তিকর বিষয়ে খোলাখুলি আলোচনা করতে ভীষণ বিব্রত বোধ করছিল কমলা। বলল, 'সব দিক ভেবে দেখলাম, অনীশদের সঙ্গে মামলা করে আমরা কিছুতেই পারব না। মাঝখান থেকে তোর বিয়ের জন্যে যে সোনাটুকু রেখেছিলাম—সব খোয়াতে হবে। তার ওপর মানহানির মামলা করে ওরা আমাদের বিপদে ফেলে দেবে। তাই—'

'ভুজঙ্গ ঘোষ কাল রাত্তিরে তোমাকে আর বাবাকে এই সব পরামর্শ দিয়ে গেছে—তাই না?'

কমলা হকচকিয়ে গেল, 'কি বলছিস বুনা!'

খুব শান্ত মুখে দীপা বলল, 'আমি সব শুনেছি মা। তিরিশ হাজার টাকার জন্যে এতবড় জঘন্য অন্যায় মেনে নিতে চাইছ!' বলতে বলতে সে টের পেল, বারান্দায় ভেজানো দরজার ঠিক বাইরে আদিনাথ দাঁড়িয়ে আছে। তাদের দু'জনের কথা শোনার জন্যই যে সে এখানে ওত পেতে রয়েছে, বুঝতে অসুবিধে হয় না। অর্থাৎ ভুজঙ্গ ঘোষ যে ফরমুলা দিয়ে গেছে কমলার মুখে তা শুনে দীপার কি প্রতিক্রিয়া হয় সেটা জানতে চাইছে।

আঁচলে চোখ ঢেকে হঠাৎ ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল কমলা। ভাঙা ঝাপসা গলায় বলল, 'আমরা বড় গরিব বুনা। আইন কানুন বিচার আমাদের জন্যে নয়। তবু এর মধ্যে যদি কিছু টাকা পেয়ে যাই— অনেক দুঃখে, নিজের ওপর অনেক ঘেন্নায় এ কথা বলছি মা।' বলতে বলতে তার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে এল।

দীপা উত্তর দিল না।

কিছুক্ষণ কান্নাকাটির পর কমলা ভয়ে ভয়ে বলল, 'তুই ত কিছু বললি না বুনা—'

দীপা অন্যমনস্কর মতো বলল, 'কি বলব।'

'তুই ত সব জানিস। ওই লোকটা এলে ত কিছু বলতে হবে।'

আদিনাথ এবং কমলার মনোভাব বুঝতে পারে দীপা। তাদের ওপর এক ধরনের করুণাই হচ্ছে। দীপা জানে, তার এই অবস্থার জন্য মা-বাবা খুবই কষ্ট পাচ্ছে, ক্ষমতা থাকলে অনীশের বিশ্বাসঘাতকতার জন্য হয়ত ওরা তাকে খুনই করে ফেলত। কিন্তু ভুজঙ্গ ঘোষ কাল রাত্তিরে যে লোভটা দেখিয়ে গেছে সেটা বঁড়শির মতো তাদের গলায় আটকে গেছে। তাদের কাছে তিরিশ হাজার টাকা একটা বিরাট ব্যাপার। মেয়ের গর্ভপাতের জন্য হাজার বার তারা নিজেদের ধিক্কার

দেবে, আত্মগ্লানিতে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত পুড়তে থাকবে, তবু টাকাটা হাত পেতে নেবেও।

মা-বাবার কথা দীপা যেমন ভাবছে, তার পাশাপাশি মণিমোহন চ্যাটার্জীর মুখটাও তার মনে পড়ে যাচ্ছে। লোকটা তাকে দেখে গলার শির ছিঁড়ে চিৎকার করেছিল, বার বার ভয় দেখিয়েছিল, হুমকি দিচ্ছিল, এমন কি অপমান করে বাড়ি থেকে বারও করে দিয়েছিল। কিন্তু ব্যাপারটা সেখানেই চুকে যায়নি। ভুজঙ্গ ঘোষকে পাঠিয়ে, অ্যাবরসানের ব্যবস্থা করে এবং প্রচুর টাকা ঘুষ দিয়ে সে চিরকালের মতো এটাকে চাপা দিতে চায়। পরে যাতে এই নিয়ে কোনো রকম ঝঞ্ঝাট বা সমস্যা না দেখা দেয় সেই কারণে পাকাপাকি বন্দোবস্ত করতে চাইছে।

দীপার আচমকা মনে হল, মণিমোহন ভীষণ ভয় পেয়েছেন, নইলে লোক পাঠিয়ে এতগুলো টাকা দিতে চাইতেন না। তার পেটে যতদিন ভ্রূণটা থাকবে তাঁর আতঙ্ক কাটবে না। গলার কাঁটার মতো ওটা সারাক্ষণ আটকে থাকবে। দীপা ঠিক করে ফেলল, নার্সিং হোমে যাবে না, পেটের ভেতর অনীশের বাচ্চা বড় হতে থাক। সে কমলাকে বলল, 'আমাকে একটু ভাবতে দাও। আর—'

দম বন্ধ করে মেয়ের দিকে তাকিয়ে ছিল কমলা। কাঁপা গলায় জিজ্ঞেস করল, 'আর কি?'

'ভুজঙ্গ ঘোষ এলে আমাকে খবর দিও। তাকে যা বলার আমি বলব।'

এরপর আর কিছু বলতে সাহস হয়নি কমলার।

দু'দিন পর রাত্রিবেলা যখন ভুজঙ্গ আবার এল তখন দীপা সবে টিউশানি সেরে বাড়ি ফিরেছে। আদিনাথের সঙ্গে উঠোন পেরিয়ে সে বারান্দায় উঠতে না উঠতেই দীপা নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে এল। কোনো রকম ভনিতা-টনিতা না করে সোজা সে ভুজঙ্গকে বলল, 'আপনি আমার সঙ্গে আসুন।' আদিনাথকে বলল, 'বাবা, তুমি

ও ঘরে যাও। ভুজঙ্গবাবুর সঙ্গে পাঁচ মিনিট কথা বলে আমি ওঁকে তোমার কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

আদিনাথ এবং ভুজঙ্গ দু'জনেই থমকে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। দীপা যে এভাবে এসে তাদের বলবে, কেউ ভাবতে পারেনি। বিস্ময়টা থিতিয়ে এলে ভুজঙ্গ বলল, 'আচ্ছা, ঠিক আছে। চলুন—'

ভুজঙ্গকে ঘরে এনে দরজা ভেজিয়ে দিল দীপা। সে টের পেল, আদিনাথ নিজের ঘরে যায়নি, প্রচণ্ড উৎকণ্ঠা নিয়ে শ্বাসরুদ্ধের মতো দরজার ওধারে দাঁড়িয়ে আছে।

যে ভুজঙ্গ কোনো কারণেই বিচলিত হয় না বা ঘাবড়ায় না, তার চোখে মুখেও অস্বস্তি দেখা দিল। অস্থির ভাবে সে বলল, 'আমাকে কিছু বলতে চান ?'

'নিশ্চয়ই।' দীপাকে বিন্দুমাত্র উত্তেজিত বা চঞ্চল দেখাচ্ছে না। খুব শান্ত গলায় সে বলল, 'আপনি ওই চেয়ারটায় বসুন।'

বিমূঢ়ের মতো ঘরের একমাত্র চেয়ারটায় বসে ভুজঙ্গ অপেক্ষা করতে লাগল। আর খানিকটা দূরে, তক্তপোষে তার মুখোমুখি বসল দীপা।

ভুজঙ্গ বলল, 'কি ব্যাপার বলুন—'

সোজা তার চোখের ভেতর চোখ রেখে দীপা বলল, 'মণিমোহন চ্যাটার্জী আপনাকে যে মতলবে আমার বাবার কাছে পাঠিয়েছে তা হবে না।'

চেয়ার থেকে প্রায় লাফিয়ে উঠল ভুজঙ্গ, 'অ্যাঁ, আপনি কি বলতে চাইছেন !'

দীপা অচঞ্চল ভঙ্গিতে বলল, 'তা আপনি ভাল করেই জানেন। মণিমোহন চ্যাটার্জীকে জানিয়ে দেবেন, আমি নার্সিং হোমে যাচ্ছি না।'

ভুজঙ্গ অন্ধকার জগতের পোকা। মণিমোহন তাকে দিয়ে নানা ধরনের গোপন গর্হিত এবং জঘন্য কাজ করিয়ে নেন। সারাটা জীবন সে নোংরা ঘাঁটাঘাঁটি করেই কাটিয়ে দিচ্ছে। তার নখের

মাথা থেকে চুলের ডগা পর্যন্ত দুর্গন্ধে বোঝাই। এই সব কাজ করতে গিয়ে কতরকম মানুষই না দেখল! কিন্তু দীপার মতো এমন তেজী বেপরোয়া মেয়ে জীবনে আর দেখছে কি? যার পেটে অবৈধ ভ্রূণ বড় হচ্ছে, আর ক'দিন পর শরীরে প্রেগনান্সির লক্ষণ ফুটে উঠলে গোটা অঞ্চলের লোক যে তার গায়ে থুতু দেবে, এ সব গ্রাহ্যই করছে না। ভুজঙ্গ বলল, 'এর ফল কি হবে বুঝতে পারছেন?'

'আমি কি পাঁচ বছরের খুকী যে বুঝব না!'

'লোকে যা-তা বলবে।'

'তা ত বলবেই।', দীপা বলতে লাগল, 'অবৈধ বাচ্চার মা হলে লোকে তাকেই ঘেন্না করে, উৎপাত করে তার জীবন নষ্ট করে দেয়। কিন্তু যে লম্পট বজ্জাতের জন্যে তার এই দুর্ভোগ, এত কষ্ট, সে বেশ পার পেয়ে যায়।' একটু থেমে বলল, 'আমি কিন্তু অনীশকে ছাড়ব না।'

ভুজঙ্গ কি বলবে, প্রথমটা ভেবে পেল না। অনেকক্ষণ পর বলল, 'ব্যাপারটা মিটমাট করে নিলে ভাল হত না?'

'বদমাস ইতর বিশ্বাসঘাতকের সঙ্গে কিসের মিটমাট?' কর্কশ গলায় বলল দীপা। তার মুখ এখন শান-দেওয়া ছুরির মতো দেখাচ্ছে।

ভুজঙ্গ বলল, 'আপনার উত্তেজিত হবার হয়ত কারণ আছে কিন্তু রাগারাগি করে ত সব সময় কাজ হয় না। বাস্তব দিকটাও মাথায় রাখতে হয়।'

'বাস্তব দিক বলতে?'

'আপনার বাবার সঙ্গে ক'দিন আগে আমার কিছু কথা হয়েছে, আপনি কি তা জানেন?'

'তিরিশ হাজার টাকা ঘুষ দিতে চেয়েছেন ত?'

ভুজঙ্গ বুঝতে পারছে, ওই তিরিশ হাজার টাকাটা দীপার কাছে ঘুষই, মোলায়েম করে উপহার বললে সে ক্ষেপে উঠবে। ভুজঙ্গ বলল, 'ঘুষ যখন বলছেন তখন আর কি বলব! অবশ্য—'

'কি?'

'তিরিশে রাজি না হলে চ্যাটার্জী সাহেবকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে ফিগারটা আরেকটু বাড়াবার চেষ্টা করব। ধরুন আরও আট দশ বাড়বে।' বলে উৎসুক চোখে দীপাকে দেখতে লাগল ভুজঙ্গ।

দীপা বলল, 'এক লাখ দিলেও আমি রাজি না।'

এক লাখেও যে রফা করতে চায় না তাকে কোন অঙ্কের টাকা অফার করবে? ভুজঙ্গের মাথার ভেতর একটা চাকা ঘুরতে লাগল যেন। গল-গল করে সে ঘামতে শুরু করেছে। দীপাকে সে যে কি বলবে, ভেবে পেল না।

দীপা এবার বলল, 'মিটমাটের একটা রাস্তাই খোলা আছে ভুজঙ্গবাবু।'

ভুজঙ্গ আশান্বিত হয়ে উঠল। গভীর আগ্রহে জিজ্ঞেস করল, 'বলুন, কি রাস্তা—'

মণিমোহন চ্যাটার্জীকে জানিয়ে দেবেন, 'টাকা দিয়ে আমাকে কেনা যাবে না। আমাকে তাঁর ছেলের বউ করে ঘরে তুলে নিতে হবে। এ ছাড়া আর কোনো রাস্তা নেই।'

ভুজঙ্গ তক্ষুণি উত্তর দিল না। তার মুখে অদ্ভুত এক নিষ্ঠুরতা ফুটে উঠতে লাগল। স্থির চোখে দীপাকে দেখতে দেখতে বলল, 'এটাই তাহলে আপনার শেষ কথা?'

'হ্যাঁ।'

'আচ্ছা, তাহলে চলি। চ্যাটার্জী সাহেবকে আপনার কথা জানাব।'

ভুজঙ্গ উঠে পড়ল। সে দরজা খুলতেই দেখা গেল মা আর বাবা বুকে শ্বাস আটকে দাঁড়িয়ে আছে। তারা ভুজঙ্গকে নিয়ে নিজেদের ঘরের দিকে চলে গেল।

পাঁচ

দ্বিতীয় বার ভুজঙ্গ যে এসেছিল তারপর আরও সাতদিন কেটে গেছে। এর মধ্যে মা আর বাবা দীপার সঙ্গে কথা প্রায় বন্ধ করে দিয়েছে। চল্লিশ পঞ্চাশ হাজার টাকা মুঠোর ভেতর এসেও বেরিয়ে গেছে। এ আক্ষেপ এবং হতাশা তাদের ঘুচবার নয়।

মাত্র কয়েক ঘণ্টার জন্য দীপা নার্সিং হোমে গেলে কি এমন মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যেত? আজকাল আকছার এসব ঘটছে। কিন্তু জেদী একগুঁয়ে মেয়ে গোঁ ধরে আছে, তাকে মণিমোহন চ্যাটার্জীর ছেলের বউ করতে হবে, যা কিনা একেবারেই অসম্ভব ব্যাপার। ফলে ওদিকটা তো গেলই, অতগুলো টাকার আশাও আর রইল না। চল্লিশ পঞ্চাশ হাজার টাকা কি একটা দুটো পয়সা! জীবনে একসঙ্গে এত টাকা আগে আর কখনও দেখেনি আদিনাথরা, ওটা পেলে বাকি জীবনটা একেবারে নিশ্চিন্ত হয়ে কাটানো যেত। কিন্তু আহাম্মক অবুঝ মেয়ে হঠকারিতার ঝোঁকে সব শেষ করে দিল।

আজ টিউশানি সেরে ছাত্রীদের বাড়ি থেকে বেরুতে বেরুতে বেশ রাত হয়ে গেল। ক্লাস ফোরের যে মেয়েটাকে সে পড়ায়, দিন পনেরো বাদে তার একটা পরীক্ষা রয়েছে। তাই একটু বেশি সময় দীপাকে ওর সঙ্গে লেগে থেকে পড়া-টড়াগুলো মাথার ভেতর ঢুকিয়ে দিতে হচ্ছে। মেয়েটা ভীষণ ফাঁকিবাজ। যেটুকু সময় দীপা থাকে ততক্ষণই বই নিয়ে বসে। বাকি সময়টা বই-টইয়ের সঙ্গে তার যোগাযোগ নেই বললেই হয়।

পয়সা বাঁচাবার জন্য বাস-টাসে ওঠে না দীপা, পায়ে হেঁটেই কসবায় যাতায়াত করে।

আজ ছাত্রীদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে অন্যমনস্কের মতো হেঁটে

আসছিল দীপা। হঠাৎ ঝপ করে লোড-শেডিং হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে গোটা অঞ্চলটা গাঢ় অন্ধকারে ডুবে যায়।

লোড-শেডিংটা কলকাতায় নতুন কোন ব্যাপার নয়। ওটা ছাড়া এই শহরকে যেন ভাবাই যায় না। এখানকার মানুষজনের দিব্য দৃষ্টি এমনই খুলে গেছে যে অন্ধকার যত ঘনই হোক, চলতে ফিরতে বিন্দুমাত্র কারও অসুবিধে হয় না।

রাত একটু বেশি হলে কলকাতার এই দিকটায় লোক চলাচল কমে যায়। মোটামুটি ফাঁকা রাস্তা দিয়ে হেঁটে আসছিল দীপা। আচমকা যে অন্ধকার নেমে গেছে সেদিকে তেমন লক্ষ্য ছিল না তার। নিজের কথাই ভাবছিল সে। সেদিন রাতে ভুজঙ্গকে জানিয়েছিল, মিটমাটের শর্ত একটাই। তাঁকে বিয়ে করে স্ত্রীর মর্যাদা দিতে হবে অনীশকে। কিন্তু এ শর্ত যে ওরা মানবে না, সে সম্পর্কে এখন আর সংশয় নেই। তাহলে এর ভেতর ভুজঙ্গ নিশ্চয়ই চলে আসত। নিজের ন্যায্য অধিকার কিভাবে আদায় করবে আজ পর্যন্ত ঠিক করে উঠতে পারেনি দীপা।

মণিমোহনের মতো প্রবল প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার রণ-কৌশল তার অজানা।

সে জানে তার পেটের বাচ্চাটার জন্য মণিমোহনরা সন্ত্রস্ত হয়ে আছেন। ভুজঙ্গ চল্লিশ পঞ্চাশ হাজার টাকা ঘুষ দিতে চাইলেও সে নার্সিং হোমে গিয়ে অ্যাবরসান কবতে চায়নি। তার একমাত্র উদ্দেশ্য পেটের ভ্রূণটাকে মণিমোহনদের বিরুদ্ধে মারাত্মক অস্ত্রের মত ব্যবহার করবে। কিন্তু কিভাবে? সেই পদ্ধতিটা কিছুতেই স্থির করতে পারছে না দীপা।

আজকাল এক মুহূর্তও সে ঘুমোতে পারে না। সর্বক্ষণ পাথরের চাঁইয়ের মতো প্রবল দুশ্চিন্তা তার মাথার ওপর চেপে বসে থাকে। এক এক সময় দীপার মনে হয়, স্নায়ুগুলো ছিঁড়ে যাচ্ছে।

বাইরে থেকে বোঝা না গেলেও, দীপা ত টের পাচ্ছে তার পেটের ভ্রূণটা ক্রমশঃ বড় হচ্ছে। শরীরের ভেতর একটা প্রচণ্ড

ভাঙচুর যে শুরু হয়ে গেছে, সেটা প্রতি মুহূর্তেই বোঝা যাচ্ছে। যদি শেষ পর্যন্ত অনীশদের সম্বন্ধে কোন একটা উপায় সে ভেবে বার করতে না পারে, কি পরিণতি হবে তার? অবৈধ একটা বাচ্চাকে নিয়ে কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে সে?

হঠাৎ রাস্তার ওধার থেকে কারা যেন চেঁচিয়ে উঠল, 'ধারে যান, ধারে যান—'

দীপা চমকে উঠল। পরক্ষণেই সে টের পেল গাঁক গাঁক করতে করতে একটা বিরাট ট্রাক প্রচণ্ড স্পীডে তার পেছন দিকে পঞ্চাশ গজের ভেতর এসে পড়েছে। বাঁচতে হলে পাঁচ সেকেণ্ডের মধ্যে তাকে কিছু একটা করতে হয়, নইলে ট্রাকটা তাকে পিষে দিয়ে চলে যাবে।

এই রাস্তাটায় ফুটপাথ নেই। মোটামুটি রাস্তার ধার ঘেঁষেই হাঁটছিল দীপা। পলকের জন্য তার চোখের সামনে অন্ধকার এলাকাটা আরও অন্ধকার হয়ে গেল। তার পরেই একরকম মরিয়া হয়ে পাশের একটা ছোট একতলা বাড়ির রোয়াকে লাফিয়ে উঠে পড়ল সে। সঙ্গে সঙ্গে ট্রাকটা তার পাশ দিয়ে উন্মত্তের মতো তীব্র গতিতে বেরিয়ে গেল।

সামলে উঠতে বেশ খানিকটা সময় লাগল দীপার। তার হৃদ্‌পিণ্ডে যেন ঝড় বয়ে যাচ্ছে। লাফ দিয়ে বারান্দায় উঠতে এক সেকেণ্ড দেরি হলে এতক্ষণে তার কি হাল যে হত, ভাবতেও শিউরে উঠছে দীপা। রক্ত মাংস এবং হাড়ের একটা ডেলা পাকানো ভয়াবহ ছবি তার চোখের সামনে ফুটে উঠতে লাগল।

হাত-পায়ের জোড় আলগা হয়ে আসছে দীপার, দাঁড়িয়ে থাকার মত শক্তি আর অবশিষ্ট নেই। আস্তে আস্তে দু'হাতে মুখ ঢেকে বসে পড়ল সে। গলগল করে ঘাম ছুটে তার জামা-টামা ভিজে যেতে লাগল।

এদিকে রাস্তার ওধার থেকে হৈ-চৈ করতে করতে আট দশটা লোক দৌড়ে এসেছে। সবার চোখে মুখে প্রচণ্ড উত্তেজনা

এবং আশঙ্কা। একসঙ্গে তারা হুড়মুড় করে কথা বলতে লাগল।

'দিদি, কিছু হয়নি ত আপনার?'

'ট্রাক ড্রাইভারটা নির্ঘাত মাল খেয়ে চালাচ্ছিল! না হলে এরকম স্পীড দেয়?'

'শালাকে পুলিসে দেওয়া দরকার।'

'এই সব লোকের লাইসেন্স কেড়ে নেওয়া উচিত।'

'ট্রাকের নম্বরটা নিতে পারলাম না। পেছন দিকের নাম্বার প্লেটের ওপর আলো ছিল না। ওটা পাওয়া গেলে ব্যাটাকে ধরে ফাঁসিয়ে দেওয়া যেত।'

লোড-শেডিংটা বেশিক্ষণ স্থায়ী হল না। ঝপ করে যেমন অন্ধকার নেমেছিল ঠিক তেমনি আচমকাই আলো ফিরে এল।

আকস্মিক মৃত্যুভয় এবং আতঙ্ক এখন অনেকখানি কেটে গেছে। আস্তে আস্তে মুখ থেকে হাত সরিয়ে দীপা সামনের দিকে তাকাল। ততক্ষণে লোকগুলো তার ওপর প্রায় ঝুঁকে পড়েছে।

উদ্বিগ্ন স্বরে একটি মধ্যবয়সী লোক জিজ্ঞেস করল, 'আপনার চোট-টোট লাগেনি ত?'

আস্তে মাথা নাড়ল দীপা—লাগেনি।

আরেকজন বলল, 'তবু একবার ডাক্তার-টাক্তার দেখিয়ে নেওয়া দরকার। কাছেই ডাক্তারখানা আছে। সেখানে চলুন—'

দীপা জানে, সে অক্ষতই আছে। প্রচণ্ড ভয় পাওয়া ছাড়া আর কোন ক্ষতিই হয়নি তার। গলাটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছিল। জোরে শ্বাস টেনে সে বলল, 'দয়া করে আপনারা একটা রিক্সা ডেকে দিন। বাড়ি গিয়ে দরকার হলে ডাক্তার দেখাব।'

একটি ছেলে রিক্সা ডেকে নিয়ে এল।

এরপর আরো দু'দিন একই ব্যাপার ঘটল। দু'দিনই দুটো ট্রাক গাঁ গাঁ করে মারাত্মক স্পীডে পেছন দিক থেকে ছুটে আসছিল।

কিন্তু লোকজনের চিৎকারে লাফিয়ে একপাশে সরে যাওয়ায় অ্যাকসিডেন্টটা আর ঘটেনি। দীপা অল্পের জন্য প্রাণে বেঁচে গেছে।

প্রথম দিন মনে হয়েছিল, ঘটনাটা নিতান্তই আকস্মিক। হয়তো ট্রাকের ব্রেক খারাপ হয়ে গিয়েছিল, কিংবা ড্রাইভার প্রচুর মদ-টদ খেয়ে নেশার ঘোরে গাড়ি চালাচ্ছিল।

কিন্তু পর পর তিন দিন একই ঘটনা যখন ঘটল তখন দীপার মনে হয়েছে, এটা অনিচ্ছাকৃত ব্যাপার নয়। অ্যাকসিডেন্ট ঘটিয়ে তাকে খুন করার একটা ষড়যন্ত্রই যেন হয়েছে। তবে এ সম্পর্কে সে পুরোপুরি নিশ্চিত নয়। তাকে খুন করে কার কি লাভ হবে, সে বুঝতে পারেনি।

বাড়িতে এ নিয়ে মা-বাবাকে কিছু জানায়নি দীপা। প্রথমতঃ তারা ভীষণ ঘাবড়ে যাবে, হয়ত টিউশানি ছেড়ে দিতে বলবে। কিন্তু টিউশানি করে বাড়তি রোজগার না করলে সংসার চলবে কি করে? মা-বাবাকে না জানালেও পিন্টুকে জানিয়েছে দীপা। পিন্টু বলেছে, 'সাবধান হয়ে রাস্তায় চলবি। আর দু-একটা দিন দেখ। যদি মনে হয় কোন হারামী তোকে মার্ডার করার ধান্দা করছে, গোল চালীপাড়া বস্তি সঙ্গে করে কসবায় চলে যাব। ট্রাক যদি তোকে ফিনিশ করতে আসে, আর ফিরে যেতে হবে না। ড্রাইভারের লাশ ওখানে শুয়ে থাকবে আর ট্রাকটা অ্যাশ হয়ে যাবে।'

পিন্টু ভরসা দিলেও বড় রাস্তা দিয়ে রাত্তিরে ফেরার ঝুঁকি নেয়নি দীপা। দিনের বেলা প্রচুর লোকজন আর বাস মিনিবাস ট্যাক্সি রিক্সা চলে, তখন অত ভয় নেই। যাবার সময় মেইন রোড দিয়েই সে যায় কিন্তু ফেরার সময় আজকাল সে গলি-টলি দিয়ে খানিকটা ঘুরপথেই বাড়ি আসে।

এভাবে দিন চারেক বেশ ভালই কাটল। তারপর আজ হঠাৎ একটা গলির মুখে আসতেই লোড-শেডিং হয়ে গেল আর তখনই অন্ধকার ফুঁড়ে দুটো ছোকরা তার সামনে এসে দাঁড়াল। তাদের

মুখ চোয়াড়ে, নিষ্ঠুর রক্তাভ চোখ, শক্ত চোয়াল। পরনে টাইট ফুলপ্যাণ্ট আর বুশসার্ট। কোমরে চওড়া বেল্ট। একজনের বাঁ হাতের কবজিতে স্টীলের বালা, আরেক জনের ডান হাতে। একজনের গলায় রুপোর চেইনে লকেট ঝুলছে, লকেটটা অবিকল একটা মীনে-করা রুপোর ড্যাগার। আরেক জনের গলাটা খালি। তবে দু'জনেরই হাতে আট ইঞ্চি ছোরা। অন্ধকারেও সে দুটোর ফলা যেন ঝলকাচ্ছে। দু'জনেরই বয়স তেইশ চব্বিশ।

বুকের ভেতর শ্বাস আটকে গেল দীপার, ছোরার ফলার দিকে তাকিয়ে আতঙ্কে তার মুখ রক্তশূন্য হয়ে গেল। মুহূর্তে গলাটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। কোন রকমে অসহ্য কাঁপা গলায় সে বলতে পারল, 'কি—কি চাই ?'

শব্দ না করে একটা ছোকরা বিশ্রী হাসল। সঙ্গে সঙ্গে দু'পাটির অনেকগুলো দাঁত বেরিয়ে পড়ল, তার দাঁতগুলো কুকুরের দাঁতের মতো ধারালো। চোখ দুটো কুঁচকে সে বলল, 'তোমার পেট চিরে বাচ্চাটা বার করে নিয়ে যেতে চাই দিদিমণি।'

চমকে উঠল দীপা। সে শুধু বলতে লাগল, 'না-না'—না-না, কিন্তু তার গলায় এবার স্বর ফুটল না।

দ্বিতীয় ছোকরাটা বাঁ পাশ থেকে দাঁতে দাঁত ঘষে বলে উঠল, 'মনে করেছ বড় রাস্তা দিয়ে না গিয়ে গলি-ফলি দিয়ে গেলে বেঁচে যাবে ! তিন-দিন-ট্রাকওলাকে ভোগা দিয়ে হড়কে গেছ। এবার তোমার লাশ ফেলে দেব।' বলেই সঙ্গীর দিকে তাকিয়ে চোখের ইশারা করে।

তৎক্ষণাৎ দু'জনের চেহারা আগাগোড়া বদলে যায়। ছোরা দুটো মাথার ওপর তুলে সরীসৃপের মতো তারা আস্তে আস্তে দীপার দিকে এগিয়ে আসতে থাকে।

আগে আর কখনও নিজের চোখে কোন হত্যাকারীকে দেখে নি দীপা। এই প্রথম সে বুঝতে পারল খুন করার সময় মানুষের মুখের চেহারা এই রকমই হয়ে যায়। বিহ্বলের মতো এক পলক তাকিয়ে

থাকে দীপা। পরক্ষণেই টের পায় তার মধ্যে অলৌকিক সাহস যেন নেমে এসেছে। শরীরের সবটুকু শক্তি জড়ো করে দু'জনকে প্রচণ্ড ধাক্কা মেরে চিৎকার করতে করতে সে উদভ্রান্তের মতো ছুটতে থাকে।

আচমকা এরকম একটা ঘটনার জন্য তৈরি ছিল না খুনী দুটো। প্রবল ধাক্কায় তারা হুড়মুড় করে রাস্তায় ছিটকে পড়ে। আর সেই সুযোগে দৌড়তে দৌড়তে গলি-টলি পেরিয়ে দীপা একটা চওড়া রাস্তায় এসে পড়ে। এখানে প্রচুর আলো, গাড়ি-টাড়ি এবং মানুষজনও অজস্র।

খুনী দুটো কয়েক সেকেণ্ড হতভম্বের মতো পড়ে থাকে। তারপরই খানিকটা সামলে নিয়ে স্প্রিংয়ের মতো লাফিয়ে উঠেই দীপা যেদিকে গেছে সেদিকে ছুটতে শুরু করে। কিন্তু গলির মুখ পর্যন্ত এসে থমকে দাঁড়িয়ে যায়। এত লোকজন এবং গাড়ি-টাড়ি দেখে আর এগুতে সাহস হয় না।

দীপা ততক্ষণে একটা বাসে উঠে পড়েছে।

পরের দিনই কসবায় ছাত্রীর বাবাকে একটা চিঠি লিখে জানিয়ে দেয়, আপাততঃ জরুরি কারণে তার পক্ষে টিউশানি করা সম্ভব না, তিনি যেন মেয়ের জন্য অন্য টিউটরের ব্যবস্থা করেন। দীপা দূরে কোথাও টিউশানি করতে যাবে না, বাড়ির কাছাকাছি কিছু একটা জুটিয়ে নেবে।

ছয়

তাকে খুন করার জন্য যে চক্রান্ত চলছে সে ব্যাপারে এখন আর এতটুকু সন্দেহ নেই দীপার। তিন দিন ট্রাকের তলায় তাকে পিষে মারার চেষ্টা হয়েছে, একদিন পেশাদার খুনীও পেছনে লাগানো হয়েছিল। কিন্তু চার বারই প্রায় অলৌকিকভাবে সে বেঁচে যায়। অবধারিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেয়ে এখনও যে দীপা টিকে আছে তার কাছে এটা একটা বিস্ময়কর ঘটনা।

মা-বাবা বা পিন্টুকে এখনও এসব কথা জানায়নি দীপা। কারণ তাকে হত্যার পরিকল্পনা বা ষড়যন্ত্র কারা করছে, হাঁ করা মাত্র ওরা ধরে ফেলবে। মা-বাবা তাতে যত না ঘাবড়ে যাবে তার চাইতে ক্ষেপে উঠবে অনেক বেশী। বলবে, কেন সে পেটের ভেতর পাপ পুষে রেখেছে, কেন সে নার্সিং হোমে গিয়ে জঞ্জাল সাফ করে এল না, ইত্যাদি ইত্যাদি।

দীপারও এক এক সময় মনে হচ্ছে ভুজঙ্গ ঘোষের কথামতো অ্যাবরসনটা করিয়ে নিলেই হয়ত ভাল হত। তাতে খুন হয়ে যাবার ভয়টা অন্ততঃ থাকত না, তার ওপর অনেকগুলো টাকাও পাওয়া যেত। কিন্তু পরক্ষণেই সেই অদম্য জেদটা তাকে পেয়ে বসেছে। দেখাই যাক, শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়। যদি মরতেও হয়, অনীশদের সে সহজে ছাড়বে না।

পিন্টুর সঙ্গেও এ নিয়ে কোন কথা বলেনি দীপা। ওর যা মাথা গরম তাতে হয়ত রাগের মাথায় বস্তির ছোকরাদের জুটিয়ে অনীশদের বাড়ি গিয়ে ঝামেলা করবে। বোমা-টোমাও মারতে পারে। তার ফল হবে মারাত্মক। পুলিস ডেকে মণিমোহন নিশ্চয়ই ওদের জেলে পাঠিয়ে দেবেন। কিংবা ওঁর যা টাকার জোর তাতে পিন্টুর পেছনে প্রফেসনাল খুনীদেরও লাগিয়ে দিতে পারেন।

দীপা বুঝতে পারছে, এখন উত্তেজনার ঝোঁকে কিছু করা ঠিক হবে না। ভেবে-চিন্তে ঠাণ্ডা মাথায় তাকে এগুতে হবে।

কিছুদিন পারতপক্ষে সে বাড়ি থেকে বেরুবে না। অবশ্য স্কুলে তাকে যেতেই হবে। আর কাছাকাছি যদি দু-একটা টিউশানি পায়, সেখানেও যাবে। এই অঘোর নন্দী লেন বা ঢালীপাড়ার বস্তির দিকটায় সে অনেকখানি নিরাপদ।

বিকেলের দিকে আজকাল দীপা যে কসবা যাচ্ছে না, সেটা লক্ষ্য করে একদিন কমলা জিজ্ঞেস করল, 'কি রে, ক'দিন ধরে দেখছি, তুই টিউশানিতে যাচ্ছিস না।'

দীপা একটু চুপ করে থাকে। তারপর মিথ্যেই বলে, 'টিউশানিটা আর নেই।'

'তাহলে—' এই পর্যন্ত বলে একটু উদ্বিগ্ন ভাবেই কমলা তাকায়।

মায়ের উদ্বেগের কারণটা বুঝতে অসুবিধে হয় না দীপার। সে বলে, 'ভেব না। তোমার টাকা পেলেই ত হয়। নতুন টিউশানি আমি যোগাড় করে নেব।'

কমলার মুখটা ম্লান দেখায়। সে বলে, 'আমি কি তোকে টাকার কথা বলেছি।'

এর উত্তর দিতে গেলে রূঢ়ই হতে হবে দীপাকে। মুখের ওপর বলতে হবে, 'টাকা ছাড়া আমার সঙ্গে তোমাদের আর ত কোন সম্পর্ক নেই।' কিন্তু এই মুহূর্তে তিক্ততা বা উত্তেজনা কিছুই ভাল লাগছে না দীপার। সে চুপ করে রইল।

খানিকক্ষণ ইতস্ততঃ করে গলা নামিয়ে কমলা বলল, 'ওই ব্যাপারটার কি হবে? কিছু ভেবেছিস?'

মা কি ইঙ্গিত দিয়েছে, বুঝতে পারে দীপা। সে বলে, 'না।'

'এখনও সময় আছে, ভুজঙ্গ বলে সেই লোকটাকে ডেকে পাঠাব? তোর বাবার কাছে সে ঠিকানা দিয়ে গেছে।'

'না।'

মেয়েকে স্থির চোখে কিছুক্ষণ দেখে কমলা। তারপর বলে,

'আমাদের মতো গরিবদের অত একগুঁয়েমি ভাল না। জেদটা এবার ছাড়।'

দীপা উত্তর দিল না।

কমলা বলতে থাকে, 'ভুজঙ্গর কথায় সেদিন রাজী হলে সব দিক থেকেই ভাল হত। কোন দুশ্চিন্তা থাকত না।'

হঠাৎ মাথার ভেতর প্রবল রক্তচাপ অনুভব করে দীপা। বলে, 'মা, চুপ কর।'

কমলা থামে না। গলা চড়িয়ে বলে, 'কেন চুপ করব? নিজের দোষে বিপদ বাধিয়ে মেজাজ দেখানো হচ্ছে!'

ক্ষেপে উঠতে গিয়েও একেবারে থ হয়ে যায় দীপা। বিমূঢ়ের মতো বলে, 'নিজের দোষে'!

'না তো কি?' কমলার গলা আরেক পর্দা চড়ে, 'তোর ইচ্ছে না থাকলে অনীশ সুযোগ নিতে পারত? শুধু শুধু অন্যের ছেলেকে একতরফা দোষ দিলে ত চলবে না।'

দীপা চমকে ওঠে। এই কথাটা মনে মনে আগেও সে ভেবেছে। হয়ত সবাই তা-ই ভাবে। তবে এখন পর্যন্ত কমলা ছাড়া আর কেউ তার মুখের ওপর এভাবে বলেনি।

আজ মায়ের ওপর কি ভর করেছে! মরিয়া হয়ে সে বলতে থাকে, 'তোর রোজগারে খাই বলে এসব সহ্য করতে হচ্ছে। এর চেয়ে মরা হাজার গুণ ভাল। কেন যে প্রাণটা বেরুচ্ছে না।'

দীপা স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে।

কমলা এক নাগাড়ে বলে যায়, 'আর ক'দিন পর তোর দিকে তাকিয়ে সবাই যখন ব্যাপারটা বুঝতে পারবে, চারদিকে ঢি ঢি পড়ে যাবে। তখন কি যে করব!' উদ্‌ভ্রান্ত দিশেহারা দেখায় তাকে।

দীপা শান্ত মুখে এবার বলে, 'তোমাদের কিচ্ছু করতে হবে না। গায়ে কেরোসিন ঢেলে নিজের হাতে আগুন ধরিয়ে দেব। মরার সময় কাউকে ফাঁসিয়ে যাব না—তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পার।'

কমলা আর কিছু বলে না। ক্রুদ্ধ হিংস্র চোখে তার দিকে একবার তাকিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

*

আরও একমাস কেটে গেল।

এর মধ্যে পাড়ার কাছাকাছি এক বাড়িতে টিউশানি যোগাড় করে নিয়েছে দীপা। ক্লাস টু আর ফোরের দু'টি মেয়েকে পড়াতে হয়। ওরা দুই বোন।

আজ দুপুরে স্কুল থেকে ফিরে কলতলায় স্নান করতে গিয়ে হঠাৎ মাথা ঘুরে পড়ে গেল দীপা। সেই সঙ্গে হুড় হুড় করে বমিও করে ফেলল। ক'দিন ধরেই মাথা ঘোরা এবং বমি বমি ভাবটা তার ছিল, কিন্তু এতটা বাড়াবাড়ি আগে হয়নি।

টিন আর দরমা দিয়ে ঘেরা কলতলার ঠিক বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল বিভা। দীপা পড়ে যেতেই সে কমলাকে ডেকেই দৌড়ে ভেতরে ঢুকে পড়ে। দীপাকে টেনে তুলতে গিয়ে নার্সের অভিজ্ঞ তীক্ষ্ণ চোখে তাকে দেখতে থাকে।

ততক্ষণে রান্নাবান্না ফেলে ছুটে এসেছে কমলা। বিভা আর সে ক্ষিপ্র হাতে দীপার সারা শরীর ধুইয়ে মুছিয়ে তার ঘরে এনে শুইয়ে দেয়।

দীপা টের পায়, আগাগোড়া বিভার দুই চোখ অনবরত তার পা থেকে মাথা পর্যন্ত ছোটাছুটি করছে। বিভার ধারালো নজর তার রক্ত মাংস এবং হাড় পর্যন্ত ফুঁড়ে ভেতরে কি যেন খুঁজতে থাকে।

এরকম তীব্র জ্বলজ্বলে চোখের দিকে তাকিয়ে থাকা যায় না, দীপা অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। প্রচণ্ড অস্বস্তিতে তার শরীর কুঁকড়ে যেতে থাকে।

কমলা অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত ভাবে কোমল গলায় জিজ্ঞেস করে, 'কি রে, হঠাৎ মাথা ঘুরে গেল কেন? কাল রাত্তিরে ঘুম হয়নি?'

'হয়েছে।' আস্তে উত্তর দেয় দীপা।

'ভাল হজম হয়েছিল?'

'হয়েছিল।'

'তা হলে এরকম হল কেন?'

'কি জানি।'

কমলা আবার কিছু বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই বিভা পাশ থেকে বলে উঠল, 'ও এখন বিশ্রাম করুক। চলুন বৌদি, আমরা বাইরে যাই। আপনার সঙ্গে একটু দরকার আছে।'

ঘণ্টাখানেক বাদে আবার যখন কমলা এ ঘরে এল তখন তাকে আগুনখাকীর মতো দেখাচ্ছে। মায়ের এমন চেহারা আগে আর কখনও দেখেনি দীপা। বিশেষ করে যেদিন থেকে সে রোজগার করে সংসার চালাচ্ছে সেদিন থেকে ভয়ে ভয়ে নিজেকে গুটিয়েই রেখেছে মা।

এই মুহূর্তে মায়ের দিকে তাকিয়ে চমকে উঠল দীপা।

কমলা দু'হাতে মাথার চুল খামচে ধরে হিস্টিরিয়া রুগীর মতো চেঁচাতে লাগল, 'এখন আমি কি করি! হে ভগবান কি করি!'

দীপা ভীত স্বরে জিজ্ঞেস করল, 'কি হয়েছে তোমার? ওরকম করছ কেন?'

তার কেন মরণ হয় না, এই সব বলে আরও কিছুক্ষণ চেঁচামেচি করল কমলা। তার চিৎকার কান্না এবং আক্ষেপের ভেতর থেকে যেটুকু জানা গেল তা এইরকম। দীপা যে গর্ভবতী হয়েছে, বিভা তা বুঝতে পেরেছে। কমলা অবশ্য বোঝাতে চেয়েছে, সংসারের জন্য দিনরাত খেটে খেটে ক্লান্তিতে দীপা মাথা ঘুরে পড়ে গেছে। কিন্তু নার্সের অভিজ্ঞ চোখে ধুলো দেওয়া অত সোজা না। যা বুঝবার সে তা বুঝে ফেলেছে। আর বিভা যে ধরনের মেয়েমানুষ তাতে তার পেটে কথা থাকে না। চব্বিশ ঘণ্টার ভেতর এধারে অঘোর নন্দী লেন ওধারে ঢালীপাড়া বস্তি মিলিয়ে যে বিরাট এলাকা, সর্বত্র দীপার ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে যাবে।

দীপা আস্তে আস্তে চমকটা কাটিয়ে ওঠে। শান্ত মুখে বলে, 'আজ হোক কাল হোক, লোকে ত জানতই। না হয় ক'দিন

আগেই জানল। আমরা ত চিরকাল এটা চাপা দিয়ে রাখতে পারব না।'

'চুপ কর তুই, চুপ কর। পেটের জন্যে তোর অনেক অত্যাচার-অপমান সহ্য করেছি, কিন্তু আর না। যদি মরিও তোর অন্ন আর মুখে তুলব না।'

দীপা আর্ত স্বরে চেঁচিয়ে ওঠে, 'মা, মা—'

কমলা আর দাঁড়ায় না, দু'চোখে আঁচল চাপা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে যায়।

বিভার সম্বন্ধে মায়ের ধারণা যে কতটা নির্ভুল দু'দিনেই টের পেয়ে যায় দীপা। এ অঞ্চলে সবাই তাকে বেশ সমীহ করে চলে। এমনিতেই বস্তির ছেলে-ছোকরারা মেয়ে-টেয়ে দেখলে জিভের ডগা কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে সিটি দেয় বা নানারকম অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি করে উত্যক্ত করে তোলে। কিন্তু দীপার এমন একটা ব্যক্তিত্ব এবং গাম্ভীর্য রয়েছে যে কেউ এসব করতে সাহস করে না। তা ছাড়া সে এখানকার প্রাইমারি স্কুলের ছেলেমেয়েদের খুব যত্ন করে পড়ায়। টীচার হিসেবে দীপা খুবই দায়িত্বশীল। এই সব কারণে ঢালীপাড়া বস্তি, অঘোর নন্দী লেন এবং আশেপাশের বিরাট এলাকা জুড়ে যত মানুষজন, সবাই তাকে ভালও যেমন বাসে, তেমনি তার সম্বন্ধে তাদের মনে এক ধরনের শ্রদ্ধার ভাবও রয়েছে।

তা ছাড়া অন্য একটা কারণেও মস্তান বা বখা ছোকরারা দীপাকে বিরক্ত করে না। কেন না সে পিণ্টুর দিদি। পিণ্টুও তো হাফ-মস্তান। দিদির পেছনে কেউ লাগলে পিণ্টু ছেড়ে দেবে না, ছুরি এবং পেটো নিয়ে গোটা এলাকা সে তোলপাড় করে ফেলবে।

আগে সে যখন স্কুলে যাতায়াত করত বা কোন কাজে রাস্তায় বেরুত, কেউ তার দিকে বিশেষ তাকাত না। তাকালে এবং চোখা-চোখি হয়ে গেলে 'কেমন আছেন দিদি?' বা 'কোথায় চললেন?' —সসম্ভ্রমে এ জাতীয় দু-একটা কথা বলত। খুবই সাধারণ সৌজন্য-

মূলক প্রশ্ন। দীপা লক্ষ্য করেছে, পিণ্টুর বন্ধুরা তাকে দেখলে চট করে হাতের তালুতে সিগারেট লুকিয়ে ফেলত।

কিন্তু ইদানীং এ অঞ্চলের লোকেরা, সে রাস্তায় বেরুলেই অদ্ভুত চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে। একদিন একটা লোককে চোখ কুঁচকে দাঁত বার করে হাসতে দেখেছে। লোকটার নাম সে জানে না, তবে মুখটা চেনা।

বাড়িতে স্বস্তি নেই। দীপা লক্ষ্য করেছে, অন্য ভাড়াটেরা আজকাল পারতপক্ষে তাদের ঘর মাড়ায় না। কেমন যেন এড়িয়ে এড়িয়ে চলে। তাদের, বিশেষ করে তাকে যেন চেনেই না, এমন একটা ভাব। অথচ দীপা চলতে ফিরতে টের পায়, চোরা চোখে বাড়ির লোকেরা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তার পা থেকে মাথা পর্যন্ত লক্ষ্য করে।

এই ভাবে দিন তিনেক কেটে গেল।

এর মধ্যে কমলা এক ফোঁটা জল পর্যন্ত খায়নি। ভীষণ জেদ তার। দীপা অনেক সাধ্যসাধনা করেছে, তার হাতে-পায়ে ধরেছে কিন্তু মাকে টলানো যায়নি। অবৈধ অবাঞ্ছিত সন্তান পেটে পুষে রেখে যে মেয়ে সংসারের সবার মুখে চুনকালি লাগিয়ে দিয়েছে তার রোজগারের ভাত সে মুখে তুলবে না। বাবা খিদেটা একেবারেই সহ্য করতে পারে না, তাই খাচ্ছে। কিন্তু দীপার সঙ্গে কথা বন্ধ করে দিয়েছে।

একমাত্র পিণ্টুকে কাছে পেলে কথা বলে মনটা হাল্কা হয় কিন্তু ক'দিন ধরে তাকেও বেশী দেখা যাচ্ছে না। মনে হচ্ছে কোন একটা ব্যাপারে সে ভীষণ জড়িয়ে গেছে। সারাদিনে হুট করে একবার এসে নাকেমুখে গুঁজেই দৌড় লাগাচ্ছে। রাত্তিরে কখন এসে আবার কখন বেরিয়ে যাচ্ছে, টেরই পাওয়া যাচ্ছে না।

দীপা যে কি করবে, ভেবে পায় না। যত দিন যাচ্ছে আরও বিভ্রান্ত, আরও দিশেহারা হয়ে পড়ছে সে। চারপাশে এমন কেউ নেই যে তাকে সঠিক পরামর্শ দিতে পারে, বুঝিয়ে দিতে পারে কি

তার করা উচিত এবং কোন্ পথে এগুলে জীবনের সবচেয়ে জটিল এই সমস্যা থেকে বেরিয়ে আসতে পারে। ক্রমশঃ সে যেন এক বায়ুশূন্য অন্ধকার সুড়ঙ্গের মধ্যে তলিয়ে যাচ্ছে।

আজ সন্ধ্যেবেলা টিউশানি সেরে বাড়ি ফিরতেই দীপার চোখে পড়ল মা-বাবার ঘরে কারা যেন কথা বলছে। থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল সে। ভাল করে লক্ষ্য করতেই মা-বাবা আর পিণ্টুকে দেখা গেল। ওরা ছাড়া আর কারা আছে, ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। দরজার দিকে পেছন ফিরে বসার জন্য ওদের মুখ চোখে পড়ছে না।

ও ঘরে কিসের আলোচনা চলছে, কে জানে। এই সময়টা কোন দিনই বাড়ি থাকে না পিণ্টু। আজ নিশ্চয়ই এমন কিছু জরুরি ব্যাপার ঘটেছে যাতে তাকে থাকতে হয়েছে।

যাদের কাছে আজকাল কেউ আসে না, হঠাৎ তাদের ঘরে কেন এত লোকের সভা বসেছে—এটা জানার জন্য অদম্য এক কৌতূহল দীপাকে পেয়ে বসে। একবার সে ভাবে সটান মা-বাবার ঘরে চলে যায়। পরক্ষণেই চিন্তাটাকে নাকচ করে আস্তে আস্তে নিজের ঘরের দিকে পা বাড়ায়। আর সেই মুহূর্তে পিণ্টু তাকে দেখতে পায়। 'দিদি, দিদি—' বলতে বলতে সে বেরিয়ে আসে।

দীপা আবার দাঁড়িয়ে পড়ে।

কাছে এসে পিণ্টু বলল, 'তোর এত দেরি হল আজ?'

দীপা জানায়, তার দুই ছাত্রীর সামনেই একটা পরীক্ষা রয়েছে। পড়াতে পড়াতে দেরি হয়ে গেছে।

পিণ্টু এবার বলে, 'সেই বিকেল থেকে নীলকান্তবাবু তোর জন্যে এসে বসে আছেন।'

রীতিমত অবাক হয়েই দীপা জিজ্ঞেস করে, 'নীলকান্তবাবু কে?'

'তুই ত আবার রাজনীতি-ফীতি বুঝিস না। গ্রেট পলিটিক্যাল লীডার। এবার আমাদের এই এরিয়া থেকে নীলকান্তদা ইলেকশানে দাঁড়াচ্ছেন।'

'আমার সঙ্গে ইলেকশানের কি সম্পর্ক?'

'ইলেকশান ফিলেকশান না, অন্য দরকারে এসেছেন নীলকান্তদা। তুই তোর ঘরে গিয়ে বস, আমি ওকে নিয়ে আসছি।' বলে আর দাঁড়ায় না পিণ্টু, দীপাকে কোন প্রশ্ন করার সুযোগ না দিয়ে পাশের ঘরে চলে যায়।

অগত্যা দীপা বিভ্রান্তের মতো নিজের ঘরে ঢোকে। তার সঙ্গে একজন রাজনৈতিক নেতার কি দরকার থাকতে পারে, সে ভেবে পায় না।

ঘরে এসে দীপা বসে না, বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে থাকে। একটু পর নীলকান্তকে নিয়ে আসে পিণ্টু। তবে মা-বাবা বা অন্য কেউ আসেনি।

নীলকান্তর বয়স ষাটের কাছাকাছি। মাথার চুল বেশির ভাগই সাদা। শরীরে একফোঁটা বাড়তি মেদ নেই। খুব লম্বা নন, মাঝারি হাইটের পেটানো স্বাস্থ্য তাঁর। পরনে ধবধবে ধুতি-পাঞ্জাবি। চোখে পুরু লেন্সের চশমা। আশ্চর্য স্নেহ মাখানো মুখ তাঁর। দেখলেই মনে হয় বাবা কি কাকার মতো আপনজন।

পিণ্টু দু'জনের আনুষ্ঠানিক পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলল, 'দিদি, তুই নীলকান্তদার সঙ্গে কথা বল। আমি যাই।' বলে ঘরের দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে চলে গেল।

দীপা একটু ইতস্ততঃ করে নীলকান্তকে বলল, 'আপনি বসুন।'

নীলকান্ত ঘরের একমাত্র চেয়ারটায় বসে বললেন, 'আপনিও বসুন মা—' তাঁর কণ্ঠস্বর এই বয়সেও বেশ সুরেলা এবং গম্ভীর।

দীপা বিছানার এক কোণে বসে জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল।

নীলকান্ত বললেন, 'মা, আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে, খুব ক্লান্ত। বেশিক্ষণ সময় আপনার নেব না। মাত্র পাঁচ মিনিট।'

দীপা উত্তর দিল না।

নীলকান্ত কোনরকম ধানাই-পানাই না করে কাজের কথায় চলে এলেন, 'মা, আপনি আমাকে নিজের সন্তানের মতো মনে করবেন। আমার কাছে আপনার কোনরকম সঙ্কোচ নেই।' এই পর্যন্ত বলে

একটু থেমে আবার শুরু করলেন, 'পিণ্টুর কাছে আপনার দুঃখের কথা সব শুনেছি। অনীশ আর মণিমোহন চ্যাটার্জীর মতো লোকেরা সমাজের, দেশের কলঙ্ক।'

দীপা শিউরে উঠেই মুখ নামিয়ে নিল, তার মাথাটা বুকের ওপর ঝুলে পড়ল যেন। সে বুঝতে পারছিল পিণ্টু আর কোন দিকে পথ না পেয়ে তার সমস্যা সমাধানের জন্য সোজা রাজনৈতিক নেতার কাছে চলে গেছে। উদ্দেশ্য, মণিমোহনদের ওপর পলিটিক্যাল প্রেসার দিয়ে তাদের দাবি মানতে বাধ্য করানো। নিশ্চয়ই পিণ্টু নীলকান্তকে তার গর্ভবতী হবার খবরও দিয়েছে। লজ্জায়, সঙ্কোচে দীপার নাকমুখ ঝাঁ ঝাঁ করতে লাগল।

নীলকান্ত বলতে লাগলেন, 'এই সব কৃমিকীটদের শায়েস্তা না করলে সোসাইটি ধ্বংস হয়ে যাবে। এ আমরা হতে দিতে পারি না। মনুষ্যত্ব টিকিয়ে রাখতে হলে এই সব অশুভ শক্তিকে গুঁড়িয়ে দিতেই হবে।' মিটিংয়ে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে রাজনৈতিক নেতাদের যা হয় নীলকান্তরও তা-ই হচ্ছিল। কথায় কথায় বক্তৃতার ঢং এসে যাচ্ছিল।

দীপা প্রায় মাটির সঙ্গে মিশে যাচ্ছিল। এবারও কিছু বলল না।

নীলকান্ত সমানে বলে যাচ্ছেন, 'আপনি কি জানেন মা, নেক্সট ইলেকশানে মণিমোহন চ্যাটার্জী এখান থেকে দাঁড়াচ্ছে। যে লম্পট বজ্জাত ছেলেকে ওভাবে প্রোটেকশান দেয়, পীপলের সঙ্গে যাদের এতটুকু সম্পর্ক নেই, যারা আপনার মতো গরিব ফ্যামিলির মেয়ের সর্বনাশ করে, তাদের জনপ্রতিনিধি হবার অধিকার নেই। ওদের আমি ক্রাশ করে দেব। এ জন্যে আপনাকে আমার পাশে চাই।'

দীপা মুখ তুলল না।

নীলকান্ত থামেননি, 'আমি একটা পরিকল্পনা করেছি। আপনাকে সঙ্গে নিয়ে এ পাড়ার প্রতিটি মানুষের কাছে যাব, জানিয়ে দেব মণিমোহন চ্যাটার্জী আপনার কতটা ক্ষতি করেছে—'

শুনতে শুনতে শ্বাস আটকে আসতে থাকে দীপার। সে পরিষ্কার বুঝতে পারে, আগামী নির্বাচনে নীলকান্ত তাকে শাণিত অস্ত্রের মতো ব্যবহার করে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী মণিমোহনকে ধ্বংস করতে চান। যে অবৈধ ভ্রূণ পেটের ভেতর বড় হচ্ছে তাকে যে এভাবে রাজনৈতিক দিক থেকে কাজে লাগানো যেতে পারে, কে ভাবতে পেরেছিল! দেখা যাচ্ছে, নিঃস্বার্থ পরোপকারের জন্য তার কাছে ছুটে আসেননি নীলকান্ত। পৃথিবীতে অবৈধ সন্তানেরও তাহলে প্রয়োজনীয়তা আছে!

দীপা মনস্থির করে ফেলল। তার চরম লজ্জাকে এবং গ্লানিকে ব্যবহার করে নীলকান্ত ইলেকশানে তরে যাবেন, এটা সে কিছুতেই হতে দেবে না। অবরুদ্ধ গলায় সে বলল, 'আমাকে ক্ষমা করবেন। এমনিতেই আমি মরে আছি। ওভাবে আমাকে রাস্তায় নামালে আত্মহত্যা করা ছাড়া উপায় থাকবে না।' বলে জোরে জোরে প্রবল বেগে মাথা নাড়তে লাগল।

নীলকান্ত বললেন, 'আপনি বুঝতে পারছেন না মা—'

কিন্তু তাঁর কথা শেষ হল না। তার আগেই দীপা বলে উঠল, 'ওভাবে বেরুলে আপনি হয়ত জিতে যাবেন, মণিমোহন চ্যাটার্জী হয়ত হেরে যাবেন, কিন্তু আমার অবস্থাটা কি হবে সেটা ভেবেছেন কি?'

তাঁর উদ্দেশ্যটা যে দীপা এভাবে এবং এত তাড়াতাড়ি ধরে ফেলবে, আগে বুঝতে পারেননি নীলকান্ত। প্রথমটা হকচকিয়ে গেলেন কিন্তু অসীম ধৈর্য এবং অধ্যবসায় তাঁর। কয়েক মুহূর্ত পর শান্ত সহিষ্ণু মুখে বললেন, 'শুধু ইলেকশানের দিকটাই দেখছেন, অন্য দিকটা কিন্তু ভেবে দেখেননি মা। এভাবে ঘুরলে মণিমোহনদের ওপর একটা প্রচণ্ড প্রেসার পড়ত। তারা শেষ পর্যন্ত আপনার সঙ্গে একটা আপোষের পথে আসতই।'

হাত জোড় করে দীপা শুধু বলল, 'আমাকে ক্ষমা করুন—'

নীলকান্ত বুঝতে পারছিলেন, এখন দীপাকে টানা-হ্যাঁচড়া করতে

গেলে লাভ হবে না। পরে আবার এসে ঠাণ্ডা মাথায় তাকে বোঝাতে হবে। চেয়ার থেকে উঠতে উঠতে বললেন, 'আজ আমি যাচ্ছি। এখন আপনি খুবই ক্লান্ত, তা ছাড়া মনটাও বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে। আমার কথাটা পরে ভেবে দেখবেন। খবর দিলেই আমি চলে আসব। মনে রাখবেন আমি আপনার শুভাকাঙ্ক্ষী।'

সাত

নীলকান্ত চলে যাবার পর পিণ্টুকে নিজের ঘরে ডেকে আনল দীপা। তারপর উন্মাদের মতো চেঁচিয়ে উঠল, 'নীলকান্তবাবুকে আমার কথা বলেছিস কেন?'

দিদির এমন উগ্র মূর্তি আগে আর কখনও দেখেনি পিণ্টু। সে বেশ ঘাবড়েই গেল, 'কি করব বল। তুই নিজে কিছু করছিস না। এদিকে লোকে গুজগুজ শুরু করে দিয়েছে। আমিও যে মণিমোহন শুয়োরের বাচ্চাটার বাড়িতে গিয়ে পেটো-ফেটো ঝাড়ব—ভেবে দেখলাম তাতে ফায়দা নেই। শালাদের যা টাকা, আমাকে ফল্‌স্‌ কেসে ফাসিয়ে দেবে। আজকাল পলিটিক্যাল হুড়ো ছাড়া কিছু হয় না। তাই নীলকান্তদার কাছে গিয়েছিলাম।'

দীপা বলল, 'আমাকে শেষ না করে তুই ছাড়বি না।'

পিণ্টু কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর বলল, 'নীলকান্তদাকে তুই ত ভাগিয়ে দিলি। কিন্তু কিছু একটা না করলে কি করে চলবে। চারিদিকে সব শালা মাকড়া ব্যাপারটা জেনে গেছে—'

দীপা হঠাৎ দু'হাতে মুখ ঢেকে অনেকক্ষণ আচ্ছন্নের মতো বসে রইল। তারপর বলল, 'আজ রাতটা আমাকে ভাবতে দে। কাল থেকে কিছু একটা করবই।'

পরের দিন সকালে পিণ্টুকে ডাকতে হল না, সে নিজের থেকেই দীপার ঘরে চলে এল। বলল, 'কি রে, কিছু ভেবেছিস?'

সারারাত ঘুমোয়নি দীপা। আরক্ত চোখে পিণ্টুর দিকে তাকিয়ে বলল, 'ভেবেছি। তোকে দুটো কাজ করতে হবে।'

'কি?'

'মণিমোহন চ্যাটার্জীর বাড়ির উল্টোদিকের ফুটপাথে দু'তিনটে তক্তাপোষ পেতে দিবি। পারবি?'

'পারব না কেন? কিন্তু ওখানে তক্তাপোষ পেতে কি হবে?'

'পরে বুঝতে পারবি।'

একটু ভেবে পিণ্টু বলল, 'কবে পাততে হবে?'

দীপা বলল, 'আজই।'

'এ ত একটা কাজ হল। আরেকটা?'

'বারো চোদ্দটা ছেলে যোগাড় করতে হবে।'

'বারো চোদ্দটা কেন, বারো চোদ্দশ' জোটাতে পারি।'

'অত দরকার নেই। যা বললাম তা পেলেই হবে। তবে দেখে যেন মনে হয় ভদ্র ফ্যামিলির ছেলে। বখা, নেশাখোর, চোয়াড়ে মার্কা চেহারা চলবে না।'

'ঠিক আছে, জেণ্টলম্যানের বাচ্চাদের মতো চেহারাই পাবি।'

'তক্তাপোষ পেতে ছেলেগুলোকে ওখানে নিয়ে বসাবি। তারপর আমাকে খবর দিবি।'

পিণ্টু চলে যাবার পর মুখটুখ ধুয়ে এসে আলতা দিয়ে খবরের কাগজে বড় বড় হরফে পোস্টার লিখতে শুরু করল দীপা।

ঠিক দু'ঘণ্টা বাদে দেখা গেল, হরপ্রসাদ সরণিতে মণিমোহনের বাড়ির ঠিক উল্টোদিকের ফুটপাথে একটা বাড়ির বাউণ্ডারি ওয়ালের ধার ঘেঁষে পর পর তিনটে তক্তাপোষ পাতা রয়েছে। মাঝখানের তক্তাপোষটায় বসে আছে দীপা এবং তাকে ঘিরে পিণ্টু এবং তার দলবল। যে পোস্টারগুলো কিছুক্ষণ আগে দীপা তার ঘরে বসে লিখেছিল, এখন সেগুলো বাউণ্ডারি ওয়ালে আঠা দিয়ে সেঁটে দেওয়া হয়েছে। পোস্টারগুলোয় যা লেখা আছে তা এইরকম ঃ

'মণিমোহন চ্যাটার্জীর ছেলে অনীশ দীপা মণ্ডল নামে একটি মেয়ের চরম ক্ষতি করেছে। সব জেনেশুনেও মণিমোহন ছেলের কুকর্মের কোনো প্রতিকার করেননি, বরং তাকে প্রশ্রয় দিয়েছেন।

'আমরা মণিমোহনকে চব্বিশ ঘণ্টা সময় দিচ্ছি। এর মধ্যে যদি তিনি একটি সম্মানজনক মীমাংসায় না আসেন, তাঁর ছেলে অনীশের কুকীর্তি বিস্তৃতভাবে ফাঁস করব।

'আপনারা হয়তো জানেন না মণিমোহন চ্যাটার্জী আগামী

নির্বাচনে বিধানসভার প্রার্থী হচ্ছেন। যিনি লম্পট শয়তান ছেলেকে প্রশ্রয় দেন, দেশ তাঁর কাছে কী আশা করতে পারে!'

হরপ্রসাদ সরণির লোকজনই শুধু না, মুখে মুখে খবর পেয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে চারপাশের মানুষ দীপাদের দেখতে এল। যত বেলা চড়তে লাগল, ভিড়ও ততই বেড়ে চলল। সেই সঙ্গে হৈচৈ, চিৎকার এবং মণিমোহনদের সম্বন্ধে নানা ধারাল মন্তব্যও চলতে লাগল।

দীপা পোস্টারে চব্বিশ ঘণ্টার আলটিমেটাম দিয়েছিল। অতটা সময় লাগল না। সন্ধ্যের পব ভুজঙ্গ ঘোষ এসে খবর দিল, মণিমোহন দীপার সঙ্গে কথা বলতে চান। রাত্রিবেলা লোকজন চলে গেলে ভুজঙ্গ এসে দীপাকে মণিমোহনের বাড়ির খিডকি দিয়ে ভেতরে নিয়ে যাবে। দীপা জানাল, তার সঙ্গে কথা বলতে হলে মণিমোহনকে তাদের অঘোর নন্দী লেনের বাড়িতে যেতে হবে।

ভুজঙ্গ বলল, 'তা হলে আমি চ্যাটার্জী সাহেবকে জিজ্ঞেস করে আসি।'

দীপা বলল, 'আসুন।'

রাস্তা পেরিয়ে ওধারে চলে গেল ভুজঙ্গ। দশ মিনিট বাদে ফিরে এসে জানাল, মণিমোহন রাত বারোটায় দীপাদের বাড়ি যাবেন।

দীপা বুঝতে পারল, মানুষজনের সামনে মণিমোহন অঘোর নন্দী লেনে যাবেন না, তাঁব মর্যাদায় আটকাবে। সবাই ঘুমিয়ে পডলে তবেই মণিমোহনের পক্ষে যাওয়া সম্ভব।

কাঁটায় কাঁটায় বারোটায় মণিমোহন দীপাদের বাড়ি এলেন। সঙ্গে ভুজঙ্গ। ঘরের দরজা বন্ধ করে ঘুমন্ত বাড়িতে আদিনাথ কমলা পিন্টু এবং দীপাব সঙ্গে তাঁর কথাবার্তা শুরু হল। দশ মিনিটের ভেতরেই এত বড় একটা জটিল সমস্যার সমাধানের সূত্রও বেরিয়ে গেল।

মণিমোহন বললেন, 'যা হবার হয়ে গেছে। লেট আস ফরগেট ইট। আমি পনেরো দিনের মধ্যে দীপাকে পুত্রবধূ করে নিয়ে যাব।'

আট

মণিমোহনের কথার নড়চড় হল না। ঠিক পনেরো দিনের মধ্যেই অনীশের সঙ্গে দীপার বিয়ে হয়ে গেল।

এ বিয়েতে প্রচুর খরচ করেছেন মণিমোহন। অজস্র আলো জ্বলেছে, নহবতখানা বসিয়ে দিনরাত সানাই বাজানো হয়েছে, বাজি পোড়ানো হয়েছে। অঘোর নন্দী লেন এবং ঢালীপাড়া বস্তির অগুণতি মানুষকে নেমন্তন্ন করে খাইয়েছেন মণিমোহন।

এই বিয়ের পেছনে মণিমোহনের সুদূরপ্রসারী একটা চাল রয়েছে। বস্তির মেয়েকে যখন পুত্রবধূ করে ঘরে তুলতেই হল তখন তা থেকে যতটা সুবিধে এবং লাভ নিংড়ে বার করে নেওয়া যায়। মণিমোহন যেন সবাইকে দেখাতে চাইছেন, তিনি কত মহানুভব, কত উদার। আসলে কিছুদিন বাদে যে নির্বাচন আসছে তাঁর লক্ষ্য সেদিকেই। এই বিয়ের জোরেই তিনি এ অঞ্চলের ভোটারদের কাছে গিয়ে হাত পাততে পারবেন।

বৌভাতের এক সপ্তাহ পর দ্বিরাগমনে এল দীপা এবং অনীশ। আদিনাথদের কাছে তিন রাত থাকার কথা ওদের, কিন্তু অনীশ এক দিন থেকেই চলে গেল। জরুরি কাজে তাকে কলকাতার বাইরে যেতে হবে। তিন দিন পর ফিরে সে দীপাকে নিয়ে যাবে।

প্রথম রাতটা কাটিয়ে পরের দিন দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর দীপা সোজা আলিপুর কোর্টে চলে এল এবং খুঁজে খুঁজে একজন ভারিক্কী চেহারার মধ্যবয়সী উকিলও বার করল। তাঁকে দিয়ে মণিমোহনের ঠিকানায় ডিভোর্সের নোটিশ পাঠিয়ে বাড়ি ফিরতে ফিরতে বিকেল হয়ে গেল।

আরও দু'দিন পর উদ্বিগ্ন মুখে অনীশ এসে হাজির। বলল, 'কি ব্যাপার, তুমি ডিভোর্সের নোটিশ দিয়েছ!'

'হ্যাঁ।' খুব শান্ত ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল দীপা।

'এর মানে?'

'খুব সহজ। তোমার সঙ্গে আমার যে বিয়েটা হয়েছে তার পেছনে ভালবাসা বা শ্রদ্ধা কিছুই নেই। যা আছে তা হল ঘৃণা সন্দেহ আর বিদ্বেষ। এর ওপর কোনো সম্পর্কই টিকতে পারে না।

'তা হলে বিয়ের জন্যে এত সব কাণ্ড করলে কেন?'

'আমার আর আমার পেটের বাচ্চাটার জন্যে একটা সামাজিক স্বীকৃতির দরকার ছিল। কুমারী মেয়ের সন্তানদের লোকে কি বলে, নিশ্চয়ই তুমি তা জানো। আমার বাচ্চাটার ওরকম দুর্ভাগ্য হোক, সেটা আমি চাইনি। তাই তোমাকে এভাবে বিয়ে করেছি।' একটানা কথাগুলো বলে একটু হাঁপায় দীপা। তারপর তীব্র গলায় আবার বলে, 'তোমাকে আমি ঘৃণা করি। ঘৃণা—ঘৃণা—ঘৃণা—'

বিভ্রান্তের মতো তাকিয়ে থাকে অনীশ।

সমাপ্ত